নূতন স্বাস্থ্য-সোপান

তৃতীয় ভাগ

ভূমিকা

নূতন পাঠ্য-বিধি যথাযথ অনুসরণ করিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়-সমূহের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর জন্য 'নূতন স্বাস্থ্য-সোপান তৃতীয় ভাগ'—রচিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সুধীগণ বিচার করিবেন। ইতি—

ফরিদপুর,
চৈত্র, ১৩৩৭

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—সপ্তম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড—অষ্টম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

নূতন স্বাস্থ্য-সোপান

প্রথমাংশ—সপ্তম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

মানবদেহের গঠন-প্রণালী

সুস্থ শরীরে জীবন ধারণ করিতে হইলে দেহতত্ত্ব-সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মানবদেহ ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। উহার প্রত্যেক অংশের নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য এবং তাহার কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে মনে হয়, এই আশ্চর্য্য জিনিসটি প্রস্তুত করা একমাত্র ভগবানেই সম্ভবে। তখন বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আমাদের মস্তক সেই বিশ্বস্রষ্টার চরণতলে নুইয়া পড়ে।

মানবদেহ একটি যন্ত্রবিশেষ। স্প্রাং, লিভার প্রভৃতি ঘড়ির অংশ নিয়মিতরূপে কার্য্য করিলে যেমন ঘড়িটি চলিতে থাকে, সেইরূপ মানবদেহের প্রত্যেক অংশ সুস্থ থাকিয়া নিয়মিতরূপে কার্য্য করিলে মানব-দেহের কার্য্য চলিতে পারে। মানবদেহের কার্য্য মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত। যথা,—(১) নড়াচড়া ও এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত (motion and locomotion); (২) পুষ্টিসাধন (nutrition), খাদ্য পরিপাক, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস

গ্রহণ ও ত্যাগ, রক্ত চলাচল ইত্যাদি; (৩) সন্তান-সৃষ্টি (reproduction)—যাহাতে মনুষ্যজাতির লোপ না হয়; এবং (৪) মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কার্য্য পরিচালনা করা (innervation)।

প্রাণী মাত্রেরই শরীরের সূক্ষ্মতম অংশকে জীবকোষ (cell) বলে। ইহা কেবল অতি সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। হংসডিম্বের মধ্যে যেমন পিচ্ছিল সাদা সাদা পদার্থ এবং হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ থাকে, প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে ঐরূপ অণুপঙ্ক (protoplasm) এবং হরিদ্রাবর্ণ পদার্থের স্থলে অণুকেন্দ্র (nucleus) থাকে।

মানবদেহকে মোটামুটি নিম্নলিখিত আটটি অংশে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) কঙ্কাল (Skeleton)

(২) মাংসপেশী (Muscles)

(৩) পরিপাক-যন্ত্র (Organs of digestion)

(৪) শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র (Organs of respiration)

(৫) রক্ত এবং রক্তবাহিকা যন্ত্র (Blood and Organs of circulation)

(৬) মলমূত্রাদি দূষিত পদার্থ নির্গমনের যন্ত্র (Excretory Organs)

(৭) স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous System)

(৮) পঞ্চ ইন্দ্রিয় (The Organs of Sense)।

১। নরকঙ্কাল ও ২। মাংসপেশী

তোমাদের হাত পা টিপিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে নরম জিনিসের নীচে একটি শক্ত জিনিস আছে; এই নরম জিনিস মাংস ও শক্ত জিনিস অস্থি। মাংসপেশী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্ত্তী চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

পার্শ্বে এবং পরপৃষ্ঠায় যে চিত্র দেখিতেছ এই দুইটি নরকঙ্কালের চিত্র। ২০৬ খানা অস্থির সংযোগে এই নর-কঙ্কাল গঠিত। মানবদেহ মাংস এবং দেহাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য যন্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইলে এইরূপ দেখাইত। মানবদেহকে নির্দ্দিষ্ট আকার প্রদান করা এই কঙ্কালের কাজ। কঙ্কাল না থাকিলে মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে পারিত না, তাহাকে পোকার মত মাটিতে গড়াইয়া চলিতে হইত।

নরকঙ্কাল ও তাহার উপরিস্থ মাংসপেশী

নর-কঙ্কালকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা,—(১) মস্তক (head or skull), (২) দেহকাণ্ড (trunk), এবং (৩) ঊর্দ্ধ ও নিম্ন অঙ্গ (the upper and the lower limbs)।
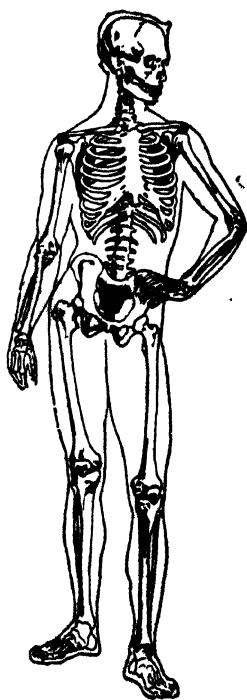
নরকঙ্কাল-
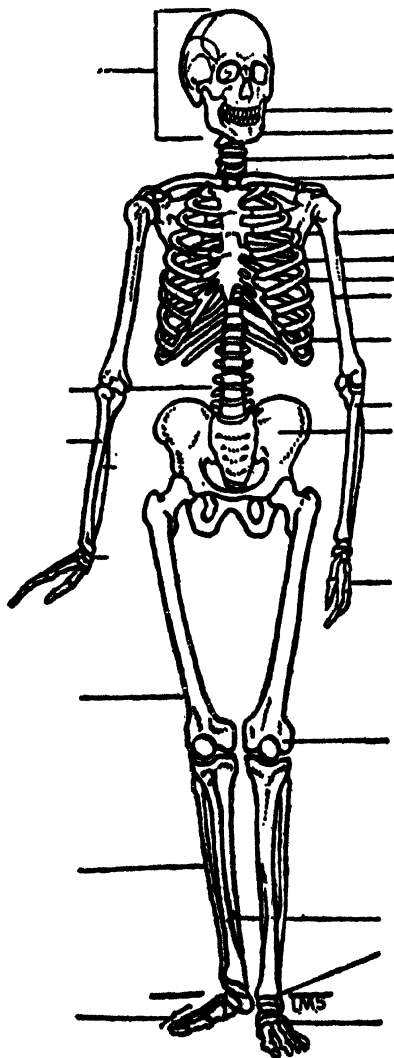
(১) **মস্তক**।—২২ খানা অস্থির সংযোগে মস্তক গঠিত। ইহা দেখিতে গোলাকার। ইহা মস্তিষ্কের (brain) আধার—ইহার মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থিত থাকে। মস্তকের কোথায় মুখ, কোথায় চক্ষু, কোথায় কর্ণ, এবং কোথায় নাসিকা থাকে তাহা চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

(২) **দেহকাণ্ড**।—মেরুদণ্ড, পাঁজরার অস্থি, বক্ষঃস্থলের অস্থি, এবং তলপেটের অস্থি এই অংশে আছে। ২৬খানি অস্থি উপর্য্যুপরি স্থাপিত হইয়া **মেরুদণ্ড** গঠিত হইয়াছে। মেরুদণ্ড মস্তকের ভার রক্ষা করে। মাথায় যে গুরুতর ভার বহন করা যায় তাহা এই মেরুদণ্ডের শক্তির জন্য। এই মেরুদণ্ড এমনভাবে গঠিত যে আমরা ইচ্ছামত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে এবং হাঁটিতে পারি, শরীর বক্র করিতে পারি। পড়িয়া যাইয়া বা ঝাঁকুনি লাগিয়া যাহাতে মেরুদণ্ডের অনিষ্ট ঘটিতে না পারে সে জন্য মেরুদণ্ডের বিভিন্ন অস্থিখণ্ডের মধ্যে একপ্রকার স্থিতিস্থাপক দ্রব্য দেওয়া থাকে।

পঞ্জর।—বক্ষঃস্থলের অস্থির দুই পার্শ্বে ১২ খানা পঞ্জরের অস্থি মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ঠিক একটি বাক্সের মত গহ্বর হইয়াছে। ইহার ভিতর ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, এবং বড় রক্তবাহিকা শিরা ও ধমনী অবস্থিত। এই গহ্বরটি এমনভাবে প্রস্তুত যে হাঁটিবার কোন অসুবিধা হয় না অথচ উপরি-উক্ত যন্ত্রসমূহ নিরাপদে কাজ করিতে পারে। বক্ষঃস্থলের নীচে যে গহ্বর তাহার মধ্যে পরিপাক-যন্ত্র, যকৃৎ, বৃক্ক (kidney)

ইত্যাদি অবস্থিত। বক্ষঃস্থল এবং উদরের গহ্বর দুইটি একটি শক্ত আবরণের (diaphragm) দ্বারা পৃথক্ করা আছে।

(৩) **ঊর্দ্ধ ও নিম্ন অঙ্গ**।—ঊর্দ্ধ ও নিম্ন অঙ্গ যথাক্রমে বাহু ও পদ। বাহু ও পায়ের হাড়গুলি দীর্ঘ ও সরু। এই নিমিত্ত আমরা যেরূপভাবে ইচ্ছা বাহু ও পা চালনা করিতে পারি। অংসফলক (shoulder blade), জত্রু বা কণ্ঠাস্থি (collar bone), বাহুর অস্থি (arm), প্রকোষ্ঠের অস্থি (fore-arm), এবং হস্তের অস্থি—এই কয়েকটি অস্থিদ্বারা ঊর্দ্ধ অঙ্গ গঠিত। স্কন্ধের অস্থি এমনভাবে প্রস্তুত যে আমরা যে ভাবে ইচ্ছা বাহু পরিচালনা করিতে পারি। প্রকোষ্ঠে দুইখানি হাড় আছে; ঐ হাড় এবং তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর সাহায্যে আমরা হাতের তালু উপুড় বা চিৎ করিতে পারি। প্রকোষ্ঠ ও হাতের তালুর সংযোগস্থানকে মণিবন্ধ বলে। মণিবন্ধে ছোট ছোট আটখানি হাড় আছে। ইহারা দুই শ্রেণীতে সাজান আছে। সম্মুখ শ্রেণীর ৪খানির সহিত ৫খানি লম্বা হাড় মিলিত হইয়া হাতের তালু নির্ম্মিত করিয়াছে। ইহাদের সহিত এক একটি আঙ্গুলের হাড় সংযুক্ত। হাতের আঙ্গুলের প্রত্যেক বৃদ্ধাঙ্গুলে ২খানি করিয়া এবং বাকি চারিটির প্রত্যেকে ৩খানি করিয়া ছোট হাড় আছে।

নিম্ন অঙ্গের কটি-প্রদেশের অস্থি (haunch bones) দেহের অস্থিসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত। দেহের ভার অনেক পরিমাণে এই অস্থিকে ধারণ করিতে হয়। এই অস্থির নীচে ক্রমশঃ উরুর অস্থি (thigh bone), জানুর অস্থি (knee

cap), জঙ্ঘার (leg) অস্থি, এবং পায়ের পাতার (foot) অস্থি। উরু প্রদেশে একখানা অস্থি আছে উহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং মোটা। জঙ্ঘায় দুইখানা করিয়া অস্থি আছে। নিম্ন অঙ্গের দ্বারা আমরা যাতায়াত করিতে পারি। গুল্‌ফদেশে ৭ খানি করিয়া হাড় আছে। তাহাদের সহিত সংযুক্ত লম্বাকৃতি হাড় পায়ের তলা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই পায়ের তলার হাড়ের প্রত্যেকের সহিত পায়ের আঙ্গুলের হাড় যুক্ত হইয়াছে। হাতের মত প্রত্যেক পায়ের অঙ্গুলিতে ১৪খানি করিয়া হাড় আছে।

অস্থি-সংযোগ।—স্কন্ধদেশে, কফোনিতে, মণিবন্ধে, পাঁজরে, গুল্‌ফদেশে, জানুদেশে, এইরূপ আরও অনেক স্থানে দুই বা ততোধিক অস্থি সংযুক্ত হইয়াছে। দুইখানি বাঁশ যেমন মিলাইয়া দড়ি দিয়া বাঁধা হয়, তেমন এই সংযোগস্থলে অস্থি এক প্রকার গ্রন্থিদ্বারা (ligament) আবদ্ধ আছে। এই নিমিত্ত আমরা ইচ্ছামত হাত পা ইত্যাদি ভাজ করিতে পারি এবং মেলিতে পারি। হঠাৎ গুরুতর আঘাত লাগিলে এই গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তখন হাড় দুইখানা ফাঁক হইয়া অথবা একখানার উপর আর একখানা উঠিয়া যাইতে পারে। এইরূপে অস্থির বন্ধন খুলিয়া গেলে (dislocation) কিরূপে চিকিৎসা করিতে হয় তাহা পুস্তকের এই অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। গুরুতর আঘাত লাগিলে কখনও কখনও হাড় মচকাইয়া বা ভাঙ্গিয়া

যায়। সুচিকিৎসার দ্বারা ভাঙ্গা হাড় পুনরায় জোড়া লাগিতে পারে (উপরি-উক্ত পঞ্চম অধ্যায় দেখ)।

অস্থি-সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন।—শিশুর অস্থি অতিশয় নরম থাকে এবং সহজেই উহা বাঁকিয়া যাইতে পারে। সুতরাং যাহাতে এইরূপে অস্থি বক্র না হয়, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। নবজাত শিশুকে যদি সকল সময় একপার্শ্বে শয়ন করান যায়, তবে তাহার মাথার আকার বিকৃত হইতে পারে। এই নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর পর তাহাকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করান প্রয়োজন। আবার, ছোট শিশুকে উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে যদি দাঁড়ান বা হাঁটানের চেষ্টা করান যায়, তবে তাহার পায়ের অস্থি বক্র হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বসিবার এবং দাঁড়াইবার দোষে আমাদের মেরুদণ্ড বক্র হয়। (এ বিষয় অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে)।

৩। পরিপাক-যন্ত্র ও উহার কার্য্য

আমাদের দেহের ক্ষয়নিবারণ ও পুষ্টিসাধনের জন্য খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন। দালানের কোন একটি অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে, সেখানে নূতন কয়েকখানা ইট বসাইয়া দিলেই উহা মেরামত হইতে পারে। কিন্তু দেহের কোন অংশের কিছু মাংস উঠিয়া গেলে, সেখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া দিলে ঐ ক্ষতস্থান পূর্ণ হয় না। দেহের যে ক্ষয়নিবারণ বা পুষ্টিসাধন তাহা শরীরের ভিতর হইতে হইবে। আমরা যাহা খাইব তাহা

পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া শরীরের ক্ষয় নিবারণ ও পুষ্টিসাধন করিবে। কিরূপে খাদ্যদ্রব্য পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহের রক্ত, মাংস, অস্থি গঠন করে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক।

পরিপাক যন্ত্রাদি (Alimentary System)।—শরীরের যে যন্ত্রগুলি ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের কার্য্য করে তাহাদিগকে পরিপাক যন্ত্রাদি বলে। ইহা মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহা একটি নল বিশেষ। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির অন্ননালী প্রায় ৩০ ফিট্ দীর্ঘ। খাদ্যদ্রব্য মুখে প্রবেশ করিবার পর এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শেষে ইহার সার পদার্থ শরীরের মধ্যে গৃহীত হয় এবং অসার পদার্থ নির্গত হয়। এই দীর্ঘ পরিপাক-প্রণালীর পাঁচটি অংশ,
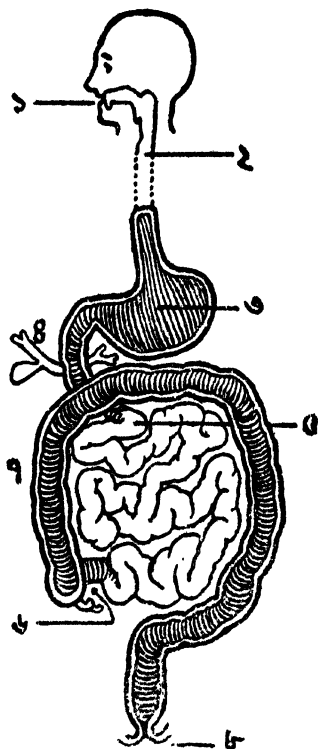
পরিপাক-যন্ত্র

১। মুখ। ২। গলনালী। ৩। পাকস্থলী ৪। পিত্তনালী। ৫। ক্ষুদ্র অন্ত্র। ৬। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের সংযোগ-স্থল। ৭। বৃহৎ অন্ত্র। ৮। মলদ্বার।

যথা—(ক) মুখ, (খ) গলনালী, (গ) পাকস্থলী, (ঘ) ক্ষুদ্র অন্ত্র এবং (ঙ) বৃহৎ অন্ত্র।

(ক) মুখ

খাদ্যদ্রব্য দেহে প্রবেশ করিবার দ্বার মুখ। ইহা যেন পরিপাক-প্রণালীর প্রথম ষ্টেশন। মুখের মধ্যে দন্ত ও জিহ্বা আছে এবং চোয়ালের নিকট লালা-গ্রন্থি আছে। জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যকে মুখের মধ্যে ইতস্ততঃ চালিত করিয়া দন্তের ক্রিয়ার সাহায্য করে। এই সময়ে লালাগ্রন্থিগুলি হইতে লালা বহির্গত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বিত হইলে উহা আমরা গলাধঃকরণ করি।

দন্ত।—দন্তের কার্য্য খাদ্যদ্রব্যকে ভাল করিয়া পেষণ বা চর্ব্বণ করিয়া উহাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করা। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির মুখে দুই সারিতে ৩২টী দন্ত থাকে। ইহাদের মধ্যে সম্মুখে ৪টি করিয়া ৮টি ছেদন-দন্ত এবং অবশিষ্ট ২৪টি পেষণ দন্ত। দন্ত দ্বারা খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিবার সময় লালা উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে।

পরিপাক-ক্রিয়ায় দাঁতের কার্য্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। খাদ্যদ্রব্য ভালরূপে চর্ব্বণ না করিলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। পরিষ্কৃত দন্ত স্বাস্থ্যের সহায়, অপর পক্ষে অপরিষ্কৃত দাঁত সর্ব্বব্যাধির আকর। দাঁত অপরিষ্কৃত থাকিলে তাহার ময়লা খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে এবং

ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে। দাঁতের উপর স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে বলিয়া ইউরোপের কোন কোন দেশে সৈনিকদিগের দন্ত এবং দন্তধাবন করিবার ব্রাস নিয়মিতরূপে
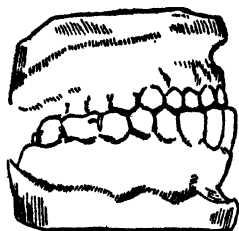
মন্দ দাঁত
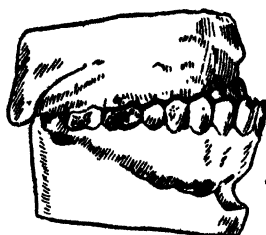
ভাল দাঁত

পরীক্ষা করা হয়। কোন কোন জীবনবীমা কোম্পানী (Life-Insurance Company) তাঁহাদের চাঁদাদাতৃগণের (policy holders) দন্ত পরীক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে দন্ত-রোগ লোককে বড় অল্পায়ু করে—সেজন্য কোম্পানীকে অধিক অর্থ দিতে হয়। সুতরাং দন্ত যাহাতে ভাল থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যহ দন্ত পরিষ্কার করা নিতান্ত দরকার।

জিহ্বা।—জিহ্বা একটি পেশীময় যন্ত্র। উহাদ্বারা আমরা স্বাদ গ্রহণ করি। উহা যেন খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করিবার জন্য দেহ-কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম কর্ম্মচারী। পচা, বাসি অনিষ্টকর খাদ্যদ্রব্য জিহ্বায় বিস্বাদ লাগে, জিহ্বা যেন তখন খাদ্যকে পরিত্যাগ (reject) করিতে বলে; আমরা উহা খাইতে

জিহ্বা

চাইনা—মুখ হইতে ফেলিয়া দিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে জিহ্বা পাকস্থলীর দর্পণস্বরূপ। পাকস্থলীর ক্রিয়া যখন ভাল না হয় এবং যখন উহা ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন জিহ্বাতে সেই অবস্থা প্রতিফলিত হয়। জিহ্বার বর্ণ (coating) দেখিয়া চিকিৎসকেরা পাকাশয়ের অবস্থা—এমন কি, রোগীর দেহের অবস্থা বুঝিতে পারেন। শরীর সুস্থ থাকিলে, পাকাশয়ের ক্রিয়া ভাল থাকিলে এবং নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। জিহ্বায় ময়লা জমিলেই শারীরিক ব্যাধির সম্ভাবনা থাকে। দাঁত মাজিবার সময় প্রত্যহ জিহ্বাও পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

জিহ্বা মুখের মধ্যে এদিক্ ওদিক্ নাড়াচাড়া করিতে পারা যায়। এই নিমিত্ত জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যকে মুখের এদিক্ ওদিক্ চালনা করিয়া দাঁতের কার্য্য করিবার সুবিধা করিয়া দেয়। জিহ্বা পরিচালিত হইলে লালা নির্গত হইয়া খাদ্য-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাকে নরম করে। জিহ্বার উপরে আবার অতি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র যন্ত্রবিশেষ (papillae) আছে। উহা খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলে আমরা আস্বাদ পাই।

লালা-গ্রন্থি।—চর্ব্বণকালে মুখে যে লালা নির্গত হয় তাহাদের উৎপত্তিস্থান কতকগুলি গ্রন্থি। ইহাদিগকে লালা-গ্রন্থি (Salivary glands) বলে। ইহারা কর্ণমূলের নিম্নে

চোয়ালের পশ্চাতে এবং চিবুকের নীচে অবস্থিত। এই গ্রন্থিগুলি হইতে ক্ষরিত রসকে মিশ্ররস কহে। এই লালা পরিপাক ক্রিয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার কার্য্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, ইহা মুখবিবরকে সিক্ত রাখে ও খাদ্যদ্রব্যকে গলাইয়া দেয় এবং খাদ্যদ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়া গিলিবার সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যকে দ্রব করে। এই নিমিত্ত তাড়াতাড়ি আহার করিতে নাই। তাড়াতাড়ি আহার করিলে খাদ্যদ্রব্য ভালরূপে লালার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না বলিয়া পরিপাক হয় না। যাহারা তাড়াতাড়ি আহার করে, তাহাদের প্রায়ই অজীর্ণ রোগ হয়।

(খ) অন্ন-নালী (Gullet)

খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া যখন আমরা গলাধঃকরণ করি তখন একটি নলের ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে যায়। এই নলের নাম অন্ন-নালী। ইহা প্রায় ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ। অন্ন-নালী ও শ্বাস-নালীর মুখ প্রায় একত্র সংলগ্ন। খাদ্যদ্রব্যকে শ্বাস-নালীর মুখ অতিক্রম করিয়া তবে অন্ন-নালীতে প্রবেশ করিতে হয়। পাছে খাদ্যদ্রব্যের কণিকা শ্বাস-নালীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্বাস রোধ করিয়া ফেলে, সেজন্য শ্বাস-নালীর উপরিভাগে একটি ঢাকনি আছে। উহাকে উপজিহ্বা বলে। খাদ্যদ্রব্য যখন শ্বাস-নালীর মুখ অতিক্রম করে, সে সময় উপজিহ্বা আপনি পড়িয়া যাইয়া শ্বাস-নালীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। অসাবধানতার ফলে যদি

দৈবাৎ খাদ্যদ্রব্যের কণিকা উহার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। এই ব্যাপারকে আমরা 'বিষম লাগা' বলি।

(গ) পাকস্থলী (Stomach)

অন্ন-নালীর পরেই পাকস্থলী। ইহা দেখিতে একটি থলিয়ার ন্যায় এবং পাকযন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত অংশ ও প্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত। পূর্ণ অবস্থায় ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ ফুট ও প্রস্থ ৫ ইঞ্চি হয়। অন্নপথের ইহা যেন দ্বিতীয় ষ্টেশন। প্রথম ষ্টেশন মুখে খাদ্যদ্রব্যের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, এখানে
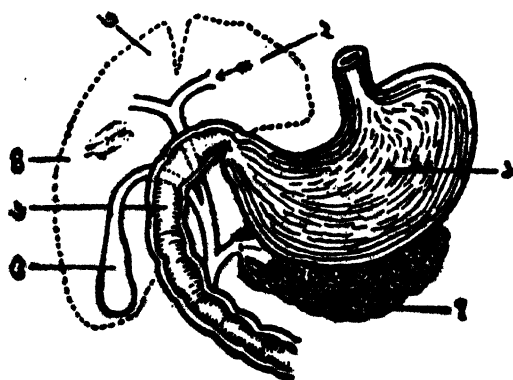
১। পাকস্থলীর মধ্যভাগের কুঞ্চিত ঝিল্লী। ২। যকৃতের বামপার্শ্ব হইতে যে পিত্তনালী আসিয়া দক্ষিণ দিকের নলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ৩। যকৃতের উত্তর অংশের মাঝে যে ফাঁক থাকে। ৪। দক্ষিণ পার্শ্বের যকৃৎ। ৫। পিত্তথলী ৬। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম অংশ (Duodenum)। ৭। অগ্ন্যাশয় (Pancreas)।

তদপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যকে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। এইখানে খাদ্যদ্রব্যের

দ্বিতীয়বার পরীক্ষা হয়। জিহ্বার পরীক্ষা এড়াইয়া যদি পরিপাকের অযোগ্য কোন পদার্থ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে তবে পাকস্থলী হইতে উহা বিতাড়িত হয় এবং বমি হইয়া বাহির হইয়া যায়; নতুবা পাকস্থলীর নিম্নের মুখ দ্বারা অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর ভিতরের গায়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি (gland) আছে, ইহা হইতে পাচক রস (gastric juice) নামক এক প্রকার রস নির্গত হয়। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য বিশেষ প্রকারে আবর্ত্তিত হইয়া উপরি-উক্ত পাচক রসের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে। যখন খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়, তখন পাকস্থলীর অভ্যন্তর দেখিতে পাইলে দেখা যাইত যে পাকস্থলীর গাত্রাবরণ হইতে ঘর্ম্মের মত এই পাচক রস নির্গত হইতেছে। এই পাচক রসের প্রধান উপাদান পেপ্‌সিন (pepsin) এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ (hydrochloric acid)। ইহারা মাংস বা ছানাজাতীয় খাদ্যের (nitrogenous food) উপর ক্রিয়া করে। সুতরাং মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি এই রসের সাহায্যে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য (starch) এই পাচকরসে হজম হয় না। পাকস্থলীর শক্তিতে খাদ্যদ্রব্য যে কর্দ্দমবৎ আকার ধারণ করে, তাহাকে 'কাইম' (chyme) বলে।

(ঘ) ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small Intestine)

পাকস্থলীর নীচেই ক্ষুদ্র অন্ত্র। ইহা প্রায় ২০ ফিট দীর্ঘ নল বিশেষ; ইহা তলপেটে কুণ্ডলি পাকাইয়া থাকে। পাকস্থলী

ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে একটি দ্বার আছে। যতক্ষণ পাকস্থলীর কার্য্য চলিতে থাকে ততক্ষণ এই দ্বার বন্ধ থাকে এবং খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। খাদ্যদ্রব্যবিশেষে উহা ত্রিশ মিনিট হইতে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাকস্থলীর মধ্যে থাকে। এখানে উহার নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে পাকস্থলীর নিম্নের দ্বার খুলিয়া যায় এবং ভুক্তদ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে; সুতরাং, ক্ষুদ্র অন্ত্র অন্নপথের তৃতীয় ষ্টেশন।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের ঊর্দ্ধ প্রান্তে (duodenum), যকৃৎ (liver) ও ক্লোম (pancreas) নামক যন্ত্র হইতে দুইটি নল প্রবেশ করিয়াছে। যকৃতের মধ্যে যে পিত্ত জন্মে তাহা সংযুক্ত নলের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। ক্লোম হইতে যে জলীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা তৎসংযুক্ত নলের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে আসে। খাদ্যদ্রব্যের সহিত এই পিত্ত ও ক্লোমরস মিশ্রিত হইয়া উহার পরিপাক-কার্য্য সম্পাদন করে। ক্লোমরসের দ্বারা শ্বেতসার, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের পরিপাক হয়। পিত্ত ঐ ক্লোমরসের কার্য্যের সহায়তা করে।

যখন খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়, তখন উহা হইতে একপ্রকার জলীয় পদার্থ প্রস্তুত হয়। এই জলীয় পদার্থ পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের গায় যে সকল রক্তকোষ (blood vessels) থাকে, তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। কয়েক পর্দ্দা কাপড়ের ভিতর দিয়া যেমন শর্করা মিশ্রিত জল আস্তে আস্তে প্রবেশ করে, এই জলীয় পদার্থও ঠিক সেইরূপ রক্তকোষের

মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। তখন রক্ত এই জলীয় পদার্থ যকৃতের ভিতর দিয়া দেহের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে এবং উহা শরীরের ক্ষয়-নিবারণ ও পুষ্টিসাধন করে।

(ঙ) বৃহৎ অন্ত্র (Large Intestine)

খাদ্য পরিপাক পাইয়া তাহার সার অংশ এইরূপে শরীরাভ্যন্তরে গৃহীত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা খাদ্যের অপকৃষ্ট বা অসার অংশ। তখন ইহা বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এই নল দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ফিট্ এবং প্রস্থে ক্ষুদ্র অন্ত্র অপেক্ষা অনেক বড়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রের সংযোগস্থলে একটি ঢাকনি আছে। উহা খুলিয়া গেলে ভুক্তদ্রব্যের অসার অংশ বৃহৎ অন্ত্রে প্রবেশ করে, কিন্তু এই ঢাকনি এইরূপভাবে সংলগ্ন যে বৃহৎ অন্ত্রের মধ্য হইতে কোন দ্রব্য ক্ষুদ্র অন্ত্রে আসিতে পারে না। বৃহৎ অন্ত্রের মধ্য দিয়া যাইবার সময় খাদ্যের অসার ভাগের পরিবর্ত্তন হয়, উহার জলীয় ভাগ শোষিত হয়। অসার অংশ শক্ত হয় এবং মলে পরিণত হয়; তখন মলে দুর্গন্ধ হয়। যে সময় বৃহৎ অন্ত্রে মল থাকে, সে সময়ে ঐ স্থানে দুর্গন্ধময় গ্যাস জন্মে। বৃহৎ অন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণ-ক্রিয়ার দ্বারা মল শরীর হইতে নির্গত হয়।

বৃহৎ অন্ত্রের মল জমিয়া যে দুর্গন্ধ ও গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তাহা শরীরের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। এই নিমিত্ত প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

পরিপাক-যন্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য।—খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণ পরিপাক পাইতে হইলে উহা ভালরূপে রন্ধন ও চর্ব্বণ করা দরকার। অর্দ্ধসিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য ভাল রকম হজম হয় না, এবং উহা খাইলে অনেক সময় পেট ফাঁপে ও পেট বেদনা হয়। অতিরিক্ত ঝাল, মসল্লা, পানীয় বা মদ খাইলে পাকস্থলীর পক্ষে তাহা হজম করা কঠিন হয়। খাদ্যদ্রব্যের সারভাগমাত্র শরীরে গৃহীত হয়, সুতরাং যে খাদ্যে সারভাগ বেশি তাহাই আমাদের আহার করা উচিত।

৪। শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র ও তাহার কার্য্য

ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পমাত্র পর হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই বক্ষঃস্থল এক একবার স্ফীত ও পরক্ষণে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা বা মুখদিয়া বায়ু প্রবেশ করে ও নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কহে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে বায়ু ফুস্‌ফুস্ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্ষঃস্থলকে স্ফীত করে, এবং বাহির হইয়া যায় বলিয়া বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত হয়। প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বক্ষঃস্থলের গঠন-প্রণালীকে কামারের একটি হাপরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হাপর এমন ভাবে চর্ম্মের ভাজদ্বারা গঠিত যে তাহাকে একবার প্রসারিত ও পরে সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে। উহার প্রসারণ দ্বারা পরিসর বৃদ্ধির সহিত আকাশস্থিত বায়ু উহার মধ্যে প্রবেশ করে। পুনরায় উহাকে চাপিয়া সঙ্কুচিত করিয়া দিলে উহার বায়ু বাহির

হইয়া যায়। হাপরের কার্য্যে আগম ও নিগমের দুইটি বিভিন্ন পথ ও নল থাকে। আমাদের বক্ষঃগহ্বর একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের ন্যায়। তন্মধ্যে উভয় পার্শ্বে দুইটি ফুস্‌ফুস্‌ অবস্থিত। এই দুইটি ফুস্‌ফুস্‌ হইতে দুইটি নল একত্র হইয়া একটি কণ্ঠনল হইয়াছে। উহাকে ইংরেজীতে ট্রেকিয়া (Trachea) বলে। ঐ কণ্ঠনল মুখ-বিবরের সহিত এবং নাসিকার গহ্বরের সহিত মিলিত। অতএব আকাশের বায়ুর সহিত ইহার অবাধ সম্মিলন। নাসিকা এবং মুখের দ্বারা বাতাস ফুস্‌ফুসের ভিতর বায়ু-কোষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। বক্ষঃস্থল এমন ভাবে অস্থিপঞ্জর ও উপাস্থিদ্বারা গঠিত যে ইহাকে হাপরের ন্যায় স্ফীত করা যাইতে পারে। বক্ষঃসংলগ্ন পেশীসকলের সঙ্কোচের দ্বারা এই স্ফীতি সাধিত হয়। এই পেশীগুলি শ্লথ হইলে অস্থি ও পঞ্জরের স্বতঃ-প্রত্যাবর্ত্তনে বক্ষঃগহ্বর ছোট হইয়া আসে। বক্ষঃগহ্বর স্ফীত হইবার সময় উহা হাপরের মত আকাশের বায়ুকে টানিয়া লয় এবং ছোট হইলে ঐ বায়ু পুনরায় বাহির করিয়া দেয়। হাপরের গাত্রে ছিদ্র হইলে উহা যেমন অকর্ম্মণ্য হয়, সেইরূপ বক্ষঃগহ্বর ছিন্ন হইলে, প্লুরা (ফুস্‌ফুসের আবরণী) মধ্যে জল বা বায়ু জমিয়া সেই
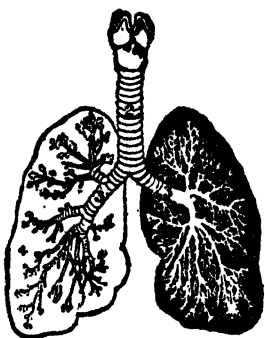
ফুসফুস্‌ (স্ফীত অবস্থা)

অংশের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। বক্ষঃগহ্বরের এই ক্রিয়া-পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে আকাশের বায়ুর চাপের এবং বক্ষঃগহ্বরের ভিতরের চাপের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে।

শ্বাস গ্রহণ কালে বক্ষঃগহ্বর তিন দিকে বৃদ্ধি পায়; যথা—উপর হইতে নিম্নে, পার্শ্বদেশে ও অগ্র পশ্চাতে। সাধারণ শ্বাস গ্রহণে বক্ষঃগহ্বর সম্মুখ দিকে ½ ইঞ্চি এবং প্রবল শ্বাসগ্রহণে ১½ ইঞ্চি বর্দ্ধিত হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের হিসাব।—একটি প্রশ্বাস বলিলে আমরা বুঝি শ্বাস গ্রহণ, খানিক স্তব্ধতা, পরে শ্বাসত্যাগ (যাহাকে নিঃশ্বাস বলা হয়), শেষে দীর্ঘ বিরাম—এইরূপে পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে। শ্বাসত্যাগ অপেক্ষা শ্বাস গ্রহণকাল অল্প; গ্রহণ-কাল যদি ১ হয়, তবে ত্যাগকাল ৪। সুস্থ অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতি মিনিটে ১৬ হইতে ১৮ বার শ্বাস গ্রহণ করে। এই শ্বাস-গ্রহণের সংখ্যা বয়স, শরীরের অবস্থা, স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে ও নানাকারণে কম বেশি হইয়া থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরই প্রায় ১ মিনিটে ৪০ বার শ্বাস গ্রহণ করে এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সংখ্যা ক্রমে কমিতে থাকে। পরিশ্রম ও অসুস্থতাতে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নিদ্রায় সংখ্যা কম হয়। হৃৎপিণ্ডের আঘাতের সহিত (যাহার স্পন্দন হস্তে অনুভব করা যায়) শ্বাস-প্রশ্বাসের একটি অনুপাত আছে। একবার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে হৃৎপিণ্ড সাধারণতঃ ৪ বার স্পন্দিত হইয়া থাকে।

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বৃদ্ধি পাইলে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসও বৃদ্ধি পায় এবং এই অনুপাত বজায় থাকে। কোন কোন ফুস্‌ফুসের ব্যাধিতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে এবং হৃৎপিণ্ডের বা নাড়ীর স্পন্দনের সাধারণ অনুপাত ঠিক থাকে না; যেমন নিউমোনিয়া রোগে হইয়া থাকে।

শ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ুর পরিবর্ত্তন।—আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার কার্য্য রক্ত মধ্যস্থিত দূষিত বাষ্পাদি বাহির করিয়া দেওয়া এবং তন্মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অম্লজান বাষ্প সরবরাহ করা। এইজন্য প্রত্যেক বায়ুকোষকে ঘিরিয়া জালের ন্যায় রক্তনালী সকল অবস্থিত থাকে। বায়ুকোষের বায়ু ও রক্তনালীর ব্যবহৃত দূষিত রক্ত অতি সূক্ষ্ম দুইটি আবরণ দ্বারা পৃথক্‌ভাবে পাশাপাশি থাকে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রক্ত এবং বায়ু এইরূপে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত থাকিলেও তাহাদের উপাদানের আদান-প্রদান সহজেই হইয়া থাকে; যথা,—

১। **উত্তাপ**।—আমরা দেখিতে পাই যে, যে বায়ু আমরা শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা অপেক্ষাকৃত শীতল, কিন্তু পরক্ষণেই যে নিঃশ্বাসবায়ু ফেলিয়া থাকি তাহা অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, বায়ু রক্ত হইতে উত্তাপ টানিয়া লইয়া উত্তপ্ত হয়।

২। **জল**—আকাশের বায়ুতে অল্পপরিমাণে জল বাষ্পাকারে থাকে, কিন্তু ঐ বায়ু যখন নিঃশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা বাহির করিয়া দেই

তাহাতে কিঞ্চিৎ অধিক জলীয় বাষ্প থাকে। তাহার প্রমাণ, শীতল দর্পণের কাছে হাই দিলে জলকণা দেখা যায়।

৩। **অম্লজান** (Oxygen)।—প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিবার সময় যে পরিমাণে অম্লজান বাষ্প থাকে, নিঃশ্বাস বায়ুতে তাহা অপেক্ষা শতকরা পাঁচ অংশ কম থাকে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, যে ঐ পাঁচ অংশ রক্তশোধিত হইবার জন্য টানিয়া লওয়া হয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে শতকরা প্রায় ৪ অংশ অঙ্গার-অম্লজান (Carbonic acid gas) নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। আকাশের বায়ুতে শতকরা ৪ অংশ (১০০ ভাগে মাত্র ৪ ভাগ) কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস থাকে। নিঃশ্বাসবায়ু ও প্রশ্বাসবায়ুতে কি কি উপাদান শতকরা কত পরিমাণে থাকে তাহা নিম্নে দেখান হইল।

		প্রশ্বাস বায়ু (যাহা গ্রহণ করা হয়)	নিঃশ্বাস বায়ু (যাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়)
(১)	অক্সিজেন গ্যাস	২১	১৬
(২)	নাইট্রোজেন গ্যাস	৭৮	৭৯
(৩)	কার্ব্বনিক এসিড	·০৪	৪·৩
(৪)	জলীয় বাষ্প	সামান্য	কিছু বেশি
(৫)	জৈবপদার্থ	সামান্য	কিছু বেশি

৪। পূর্ব্বোক্ত উপাদানগুলি ছাড়া, এমোনিয়া প্রভৃতি শরীরের নানাপ্রকার অব্যবহার্য্য ক্লেদও শরীর হইতে নিঃশ্বাসের

সহিত বাহির হইয়া থাকে। যদি একটি ঘরে বহুলোকের সমাবেশ হয় এবং তাহাতে বায়ু চলাফেরার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেই ঘরে একটা দুর্গন্ধ হয়, এবং পরে যাহারা ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে যায়, তাহারা ঐ দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পারে। কতকগুলি পচনশীল পদার্থই এইরূপ দুর্গন্ধের কারণ। অতএব বায়ু বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দরজা জানালা প্রত্যেক ঘরে রাখা বিশেষ আবশ্যক। যে নগরীতে বহু কারখানা এবং বহু লোকজন অল্পস্থানের ভিতর বাস করে, তথাকার বায়ুতে এত বেশি পরিমাণে কার্বনিক এসিড গ্যাস থাকিতে পারে যাহাতে বায়ু নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এইরূপ স্থানে যক্ষ্মারোগের বীজাণু বহু পরিমাণে থাকে। এজন্য বহুজনপূর্ণ সহরে যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এই ব্যাধির প্রতিকারকল্পে স্বাস্থ্যবিভাগের নির্দ্দেশ অনুসারে স্বাস্থ্যপ্রদ ঘরবাড়ী এবং সহরের মাঝে মাঝে পুকুর ও বাগান প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইতেছে।

ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যস্থিত রক্তের পরিবর্ত্তন।—রক্ত শরীরে পরিভ্রমণ করিয়া যখন হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন ইহা অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে। রক্ত যে পরিমাণ অম্লজান বাষ্প ফুস্‌ফুসের বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়া লয় তাহা ক্রমে হারাইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং শরীরের দহন ক্রিয়া-জনিত যে উত্তাপ তাহা কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে

বলিয়া নিজে উত্তপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত অঙ্গার-অম্লজান বাষ্প, জলীয় বাষ্প এবং অনেক জৈব পদার্থ লইয়া আসে। দেহের এই সকল ক্লেদ ফুস্‌ফুসের নিকট আনিয়া তাহার অধিকাংশ বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত আদান-প্রদান দ্বারা নিজে বিশুদ্ধ ও কার্য্যক্ষম হয়; যথা,—

১। রক্ত নিজের উত্তাপ বায়ুকে দেয় ও নিজে শীতল হয়।

২। জলীয় বাষ্প নিঃশ্বাসবায়ুকে দিয়া থাকে।

৩। রক্ত কৈশিক ঝিল্লির দ্বারা প্রস্তুত নালীর ভিতর দিয়া যাইবার সময় উহার গাত্রস্থিত তন্তুর (tissue) মধ্যে অম্লজান বাষ্প দিয়া থাকে এবং সেই সময়ই তন্তু হইতে অঙ্গার-অম্লজান বাষ্প টানিয়া লয়। ফলে, রক্তের ঘোর লালবর্ণ ঈষৎ নীলাভ হয়। এই নীলাভ রক্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফুস্‌ফুসে জালময় রক্তনালীর ভিতর আসে। তখন দুইটি ঘটনা ঘটে। প্রথমতঃ, বায়ুকোষ হইতে অম্লজান লইয়া রক্ত লালবর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, অঙ্গার অম্লজান ছাড়িয়া দিয়া নিজে পরিষ্কৃত হয়। এইরূপে প্রতিবার শতকরা ৮—১২ ভাগ অম্লজান লইয়া থাকে এবং ৭ ভাগ অঙ্গার-অম্লজান বাহির করিয়া দিয়া থাকে। বিভিন্ন কারণে অঙ্গার-অম্লজান বাষ্পের উৎপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যথা,—

(১) পরিশ্রম দ্বারা ঐ বাষ্প বৃদ্ধি হয়। নিদ্রায় ২০০ কিউবিক সেন্টিমিটার, জাগরণে ২৫০, সাধারণ কার্য্যে ৩০০ ও কঠিন পরিশ্রমে ৫০০ কিউবিক সেন্টিমিটার বাষ্পের উদ্ভব হয়।

(২) খাদ্য—শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য অধিক বাষ্প উৎপাদন করে।

(৩) বয়স—জননী-জঠরে অল্প, শিশুকালে অল্প, বাল্যকালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পূর্ণ বয়সে ও বৃদ্ধবয়সে বাল্যকাল অপেক্ষা অল্প হয়।

(৪) ব্যাধি—জ্বর প্রভৃতি ব্যাধিতে তন্তু প্রভৃতির দাহ অধিক হয় বলিয়া অঙ্গার-অম্লজান বাষ্প অধিক উৎপন্ন হয়। এজন্য রোগী ঘন ঘন প্রশ্বাস টানিয়া বেশি পরিমাণ অম্লজান গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব জ্বরের রোগী যাহাতে বেশি বিশুদ্ধ বাতাস পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশৃঙ্খলা বা শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।—যখন কোন কারণে অম্লজান বাষ্প (Oxygen) স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কমিয়া যায়, তখন উহা পরিপূরণের জন্য নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় চেষ্টাই অধিক প্রবল হয়। এই অবস্থাকে **শ্বাসকৃচ্ছ্রতা** (Dysponea) কহে। যদি এই চেষ্টায় রক্ত মধ্যে পরিমিত অম্লজান বাষ্প গৃহীত না হয় এবং ক্রমে পরিমাণ কমিতে থাকে ও সেই সঙ্গে অঙ্গার অম্লজান গ্যাস বৃদ্ধি পায়, তবে শ্বাস গ্রহণ অপেক্ষা শ্বাস ত্যাগের চেষ্টাই অধিক হয়। এইরূপে ক্রমে বক্ষঃগহ্বরের মাংসপেশীর আক্ষেপ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। এই অবস্থাকে **খেঁচুনি** (Convulsion) বলে। পরে চৈতন্য নষ্ট হয় এবং শ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হয়। এই

অবস্থায় চক্ষুর মণি প্রসারিত হয় এবং চক্ষুর মধ্যে হাত দিলে রোগী উহা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটি প্রবল শ্বাসগ্রহণের চেষ্টা লক্ষিত হয়। শেষে সংজ্ঞা লুপ্ত হয়; এই অবস্থাকে **শ্বাসরোধ** (Asphyxia) বলে। শ্বাসরোধের তিনটি অবস্থা হয়; যথা,—

(১) নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় চেষ্টাই প্রবল।

(২) আক্ষেপ ও বিক্ষেপ সহ প্রশ্বাস প্রবলতর।

(৩) অচৈতন্য অবস্থা—মধ্যে মধ্যে গভীর শ্বাসগ্রহণের চেষ্টা।

অতএব সর্ব্বদা মনে রাখিবে, পরিমিতরূপ অম্লজান বাষ্প বাতাস হইতে গ্রহণ করিতে পারিলে এবং অঙ্গার-অম্লজান বাষ্প নিয়মিত ভাবে বহিষ্কৃত না হইলে শ্বাসরোধ হইতে পারে। এজন্য তোমরা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ু সেবন করিবে এবং বক্ষঃ-গহ্বরের মাংসপেশীর বল রক্ষার জন্য ব্যায়াম করিবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রাণায়ামাদি (Breathing exercise) শিক্ষা করিয়া উহা অভ্যাস করিলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্য উত্তম ব্যায়াম করা হয়।

৫। রক্ত এবং রক্তবাহিকা যন্ত্র—রক্ত-সঞ্চালন

রক্তই মানব জীবনের উৎস। ইহা মানুষের সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয়। বক্ষঃস্থলের বামদিকে হাত দিয়া দেখ, কি যেন ধুকধুক করিতেছে। ইহা হৃৎপিণ্ড। এই হৃৎপিণ্ড যেন একটি পাম্প। ইহা সর্ব্ব-শরীরে রক্ত প্রেরণ করিতেছে।

দেহে বহু ধমনী আছে। তাহার মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ড হইতে অনবরত রক্ত প্রবাহিত হইতেছে এবং শিরা দ্বারা দূষিত রক্ত তথায় ফিরিয়া আসিতেছে। যদি চর্ম্ম, শিরা এবং ধমনী-গুলি কাচের মত স্বচ্ছ হইত তবে আমরা এই রক্ত-প্রবাহ দেখিতে পাইতাম। শরীরে রক্তবাহিকা যন্ত্রের চারিটি অংশ, যথা—(১) হৃৎপিণ্ড (heart), (২) ধমনী (arteries), (৩) ধমনীর শাখাপ্রশাখা(capillaries) এবং (৪) শিরা (vein)।

১। হৃৎপিণ্ড ২। বৃহৎ ধমনী ৩। ধমনী ৪।৫। ধমনী ৬.৭.৮.৯। শিরা।

হৃৎপিণ্ড — হৃৎপিণ্ড একটি থলিয়ার মত। ইহা দেখিতে মানুষের মুষ্টির সমান। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন জীবনীশক্তির সূচনা হইতেই এই হৃৎপিণ্ডের কার্য্য আরম্ভ হয়। নিদ্রিত বা জাগ্রত, যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, হৃৎপিণ্ড অবিশ্রান্ত দেহের সর্ব্বত্র রক্ত প্রেরণ করিতেছে। মানুষের ইচ্ছাতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয় নাই বা চলিতেছে না, বা মানুষের ইচ্ছানুযায়ী বন্ধও হইবে না। যতদিন আমরা

জীবিত থাকিব, ততদিন ইহার কার্য্য চলিতে থাকিবে; যে মুহূর্ত্তে ইহার কার্য্য বন্ধ হইবে, তখনই আমাদের মৃত্যু হইবে। বক্ষঃস্থলের পঞ্জরের অস্থি দ্বারা যে একটি বাক্সের মত আবদ্ধ প্রকোষ্ঠ গঠিত হইয়াছে, তাহারই মধ্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান। ইহার একটু বামদিকে ইহার সহিত দক্ষিণে ও বামে ফুস্‌ফুসের সংযোগ আছে। ইহা হইতে দুইটি বড় শিরা এবং ধমনী বাহির হইয়া গিয়াছে।

রক্ত-সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা

(চিত্র দ্রষ্টব্য)

১। মস্তিষ্ক হইতে দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রথম প্রকোষ্ঠে ফিরিতেছে। ২। হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে ফুসফুসের দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইতে যাইতেছে। ৩। হৃৎপিণ্ডের প্রথম প্রকোষ্ঠ (Right auricle)। ৪। নিম্নাঙ্গে দেহকাণ্ড হইতে শিরাদ্বারা দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রথম প্রকোষ্ঠে যাইতেছে। ৫। হৃৎপিণ্ডের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ (Right ventricle) ১৪। বৃহৎ ধমনী—হৃৎপিণ্ডের বাম দিকের নিম্নপ্রকোষ্ঠ হইতে পরিষ্কৃত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ১৫। ফুসফুসে রক্ত সঞ্চালন-ক্রিয়া প্রদর্শন। ১৬। ফুস্‌ফুস্ হইতে পরিষ্কৃত রক্ত হৃৎপিণ্ডের বামদিকে উপরের প্রকোষ্ঠে নীত হইতেছে; ১৭। হৃৎপিণ্ডের বাম দিকের উপরের প্রকোষ্ঠ হইতে পরিষ্কৃত রক্ত নিম্ন প্রকোষ্ঠে বহিতেছে। ১৮। হৃৎপিণ্ডের নিম্ন প্রকোষ্ঠ হইতে রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে।
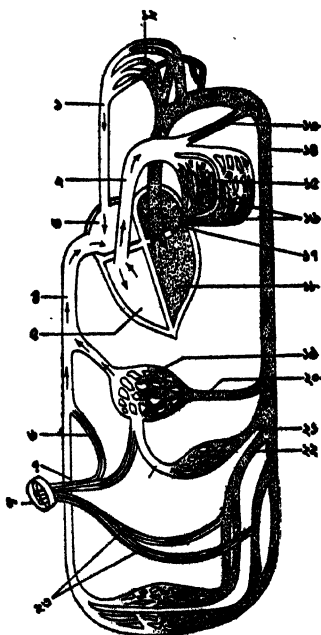
রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া

হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ত্রিবিধ, যথা—ইহা (১) সমস্ত শরীর হইতে দূষিত রক্ত গ্রহণ করে, (২) ঐ দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করিয়া পুনরায় বিশুদ্ধ করে (৩) তৎপর বিশুদ্ধ রক্ত সমস্ত শরীরে প্রেরণ করে। হৃৎপিণ্ড পর্য্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। হৃৎপিণ্ডে যে ধুক্ ধুক্ শব্দ হয় তাহা এই জন্যই। হৃৎপিণ্ডের এই সঙ্কোচন তালে তালে হয় বলিয়া বক্ষের উপরে কান রাখিলে যে শব্দ শ্রুত হয় তাহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত,—যেমন (১) লাব্ (২) ডাপ্ (৩) বিশ্রাম। প্রথমতঃ স্বল্প দীর্ঘ ও গভীর শব্দটি হৃৎপিণ্ডের নিম্নভাগের কুঠরি দুইটির একত্র সঙ্কোচনের দ্বারা উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় শব্দটি অল্প সময় স্থায়ী এবং উহা উপরের ও নীচের কুঠরিদ্বয়ের দরজা সজোরে বন্ধ হওয়ার জন্য উৎপাদিত হয়। হৃৎপিণ্ডের এই সঙ্কোচন (contraction) এবং প্রসারণের (dilation) দ্বারাই দেহের রক্তপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

হৃৎপিণ্ডকে মোটামুটি দক্ষিণ ও বাম এই দুই অংশে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক অংশে আবার দুইটি করিয়া কুঠরি আছে; একটি উপরে, একটি নীচে। উপরের কুঠরি (auricle) এবং নীচের কুঠরির (ventricle) মধ্যে দরজা আছে। এই দরজা থাকায় নীচের কুঠরি হইতে উপরের কুঠরিতে রক্ত প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের মোট চারিটি কুঠরি (chamber) আছে।

হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ দেহ হইতে দূষিত রক্ত টানিয়া লয়

এবং উহাকে ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করিয়া বিশুদ্ধ করে; আর, বাম অংশ ঐ বিশুদ্ধ রক্ত সর্ব্বদেহে প্রেরণ করে। শরীরের দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশের উপরের কুঠরিতে প্রবেশ করে, সেখান হইতে উহার নীচের কুঠরির মধ্যে দিয়া যাইয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে এবং সেখানে বিশুদ্ধ হয়। তৎপর এই বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম অংশের উপরের কুঠরিতে প্রবেশ করে, সেখান হইতে উহার নিম্ন কুঠরিতে যায় এবং সেখান হইতে সর্ব্বদেহে প্রেরিত হয়।

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড ৭২ হইতে ৮০ বার স্পন্দিত হয়। ব্যায়াম করিলে বা অসুস্থ হইলে এই স্পন্দনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হয়। শিশুর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সংখ্যা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির স্পন্দনের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি।

ধমনী (artery) **ও শিরা** (vein)।—হৃৎপিণ্ডের উপরাংশ হইতে একটি বড় ধমনী (Aota) বাহির হইয়াছে। এই ধমনী হইতে বহু শাখা এবং প্রশাখা বাহির হইয়াছে। এইগুলি ফাঁপা নলের মত। ইহাদের মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। ধমনী সকল আবার অতি সূক্ষ্ম হইতে হইতে যখন চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্ম নালীময় জালে পরিণত হয়, তখন তাহাদিগকে কৈশিকা (capillary) কহে। ইহারা এত অসংখ্য এবং এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে দেহে অতি সূক্ষ্ম সূচ্যগ্র প্রবেশ করাইলেও ইহাদের একটি-না একটি স্পর্শ করিবে। যখন হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হয়, তখন ইহা হইতে রক্ত বাহির হইয়া বড় ধমনীতে প্রবেশ

করে এবং তৎপর ইহার অসংখ্য শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়।

সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হইয়া এই রক্ত দূষিত হয়, এবং ক্রমে ছোট ছোট শিরা নামক রক্তবাহক নলের মধ্য দিয়া ও পরে বড় বড় শিরার ভিতর দিয়া এই রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণাংশে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। হৃৎপিণ্ডের সহিত ফুসফুসের যোগ আছে। হৃৎপিণ্ড এই দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে প্রেরণ করিয়া তথায় বিশুদ্ধ করে, এবং পুনরায় এই বিশুদ্ধ রক্ত সর্ব্বদেহে প্রেরিত হয়। শিরার মাঝে মাঝে দরজা থাকায় দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আর পথ হইতে ফিরিয়া যাইতে পারে না।

রক্ত—রক্ত দেখিতে লালবর্ণ, ইহা তোমরা সকলেই জান। ইহা ঘন জলীয় পদার্থবিশেষ। এক ফোটা রক্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে ইহার মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
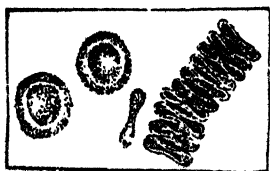
লোহিত কণিকা

বড় বড় চারিটি শ্বেত কণিকা,
অবশিষ্টগুলি লোহিত কণিকা

লালবর্ণের গোলাকার পদার্থ দেখা যায়। এইগুলিকে লোহিত কণিকা (red corpuscles) বলে। ইহা ছাড়া, রক্তের মধ্যে সাদা সাদা পদার্থও আছে। সেগুলিকে শ্বেত-কণিকা

(white corpuscles) বলে। ছোট ছোট মাছ যেমন নদীর জলে ভাসিয়া বেড়ায়, এই লাল এবং শ্বেত কণিকাগুলিও তেমনি রক্তের মধ্যে ভাসিয়া থাকে।

লোহিত-কণিকা।—ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর ও যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিতে রক্তকণিকাগুলি কমিয়া যায়, তখন লোকের চেহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়। রক্ত-কণিকা কমিয়া গেলে রক্তের কার্য্য করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া যে সার অংশ প্রস্তুত হয়, তাহা এই রক্ত দ্বারা দেহের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত হয়। সুতরাং রক্ত দেহের খাদ্যপ্রেরণ-বিভাগ (Transportation Department)। ইহার কার্য্য ত্রিবিধ, যথা—(১) ফুসফুসে যে অম্লজান গৃহীত হয় তাহা দেহের সর্ব্বত্র প্রেরণ করা; (২) ভুক্তদ্রব্যের সার অংশ দেহের সর্ব্বত্র সরবরাহ করা এবং (৩) দূষিত পদার্থগুলি ফুস্‌ফুস্, মূত্রগ্রন্থি (Kidney) এবং চর্ম্মে লইয়া যাওয়া। এই সকল স্থান হইতে দূষিত পদার্থ নিঃশ্বাস, মূত্র এবং ঘর্ম্মের সহিত দেহ হইতে নির্গত হয়।

শ্বেতকণিকা।—শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে বা অন্য কোন প্রকারে ব্যাধিগ্রস্থ হইলে, রক্তই তাহাকে ব্যাধিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে। রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি যেন আমাদের দেহরক্ষী সৈন্য। যাহাতে ব্যাধির বীজাণু, ধূলি, কাঁটা প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করিয়া দেহের ক্ষতি না করিতে পারে সেইদিকে তাহাদের লক্ষ্য। কোন বীজাণু শরীরে প্রবেশ করামাত্র

শ্বেতকণিকাগুলি তাহাকে আক্রমণ করিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। বীজাণু প্রবেশ করামাত্রই কিরূপ ভীষণভাবে শ্বেত-কণিকাগুলি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল, যখন রোগের বীজাণুর সংখ্যা বা শক্তি বেশি হয় বা রক্তের কণাগুলি এই সকল বীজাণুকে নির্গত করিতে সক্ষম হয় না, তখনই আমরা ব্যাধিগ্রস্ত হই। তখন শ্বেতকণিকাগুলি পূয়ে পরিণত হয়।

বিশুদ্ধ রক্ত।—রক্তই যখন মানব-জীবনের উৎস, রক্তই যখন দেহের ব্যাধি মুক্ত করে, তখন যাহাতে বিশুদ্ধ রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা যাহা খাই তাহা হইতে রক্তের উপাদান উৎপন্ন হয়। সুতরাং পুষ্টিকর সুখাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য; নতুবা প্রচুর পরিমাণে ভাল রক্ত উৎপন্ন হইবে না এবং তাহার ফলে দেহের ক্ষতি হইবে—দেহ দুর্ব্বল এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইবে। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করা উচিত, তাহা হইলে রক্তের জলীয় অংশ প্রয়োজনমত থাকিবে এবং উহা বহির্গত হওয়ার সময় দূষিত পদার্থগুলি দূর হইবে। বিশুদ্ধ রক্ত পাইতে হইলে মুক্ত বায়ুতে নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। মদ, তামাক, গাঁজা প্রভৃতি খাইলে রক্তের শ্বেতকণিকা ও লোহিতকণিকাগুলি নষ্ট হয়। তাহার ফলে রক্তের জোর কমিয়া যায়। যাহাতে রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় এইরূপ কোন প্রকার খারাপ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিবে না।

(white corpuscles) বলে। ছোট ছোট মাছ যেমন নদীর জলে ভাসিয়া বেড়ায়, এই লাল এবং শ্বেত কণিকাগুলিও তেমনি রক্তের মধ্যে ভাসিয়া থাকে।

লোহিত-কণিকা।—ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর ও যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিতে রক্তকণিকাগুলি কমিয়া যায়, তখন লোকের চেহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়। রক্ত-কণিকা কমিয়া গেলে রক্তের কার্য্য করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া যে সার অংশ প্রস্তুত হয়, তাহা এই রক্ত দ্বারা দেহের সর্ব্বস্থানে পরিচালিত হয়। সুতরাং রক্ত দেহের খাদ্যপ্রেরণ-বিভাগ (Transportation Department)। ইহার কার্য্য ত্রিবিধ, যথা—(১) ফুসফুসে যে অম্লজান গৃহীত হয় তাহা দেহের সর্ব্বত্র প্রেরণ করা; (২) ভুক্তদ্রব্যের সার অংশ দেহের সর্ব্বত্র সরবরাহ করা এবং (৩) দূষিত পদার্থগুলি ফুস্‌ফুস্, মূত্রগ্রন্থি (Kidney) এবং চর্ম্মে লইয়া যাওয়া। এই সকল স্থান হইতে দূষিত পদার্থ নিঃশ্বাস, মূত্র এবং ঘর্ম্মের সহিত দেহ হইতে নির্গত হয়।

শ্বেতকণিকা।—শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে বা অন্য কোন প্রকারে ব্যাধিগ্রস্থ হইলে, রক্তই তাহাকে ব্যাধিমুক্ত করিতে চেষ্টা করে। রক্তের শ্বেত কণিকাগুলি যেন আমাদের দেহরক্ষী সৈন্য। যাহাতে ব্যাধির বীজাণু, ধূলি, কাঁটা প্রভৃতি শরীরে প্রবেশ করিয়া দেহের ক্ষতি না করিতে পারে সেইদিকে তাহাদের লক্ষ্য। কোন বীজাণু শরীরে প্রবেশ করামাত্র

শ্বেতকণিকাগুলি তাহাকে আক্রমণ করিয়া নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। বীজাণু প্রবেশ করামাত্রই কিরূপ ভীষণভাবে শ্বেত-কণিকাগুলি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেবল, যখন রোগের বীজাণুর সংখ্যা বা শক্তি বেশি হয় বা রক্তের কণাগুলি এই সকল বীজাণুকে নির্গত করিতে সক্ষম হয় না, তখনই আমরা ব্যাধিগ্রস্ত হই। তখন শ্বেতকণিকাগুলি পূযে পরিণত হয়।

বিশুদ্ধ রক্ত।—রক্তই যখন মানব-জীবনের উৎস, রক্তই যখন দেহের ব্যাধি মুক্ত করে, তখন যাহাতে বিশুদ্ধ রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা যাহা খাই তাহা হইতে রক্তের উপাদান উৎপন্ন হয়। সুতরাং পুষ্টিকর সুখাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য; নতুবা প্রচুর পরিমাণে ভাল রক্ত উৎপন্ন হইবে না এবং তাহার ফলে দেহের ক্ষতি হইবে—দেহ দুর্ব্বল এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইবে। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করা উচিত, তাহা হইলে রক্তের জলীয় অংশ প্রয়োজনমত থাকিবে এবং উহা বহির্গত হওয়ার সময় দূষিত পদার্থগুলি দূর হইবে। বিশুদ্ধ রক্ত পাইতে হইলে মুক্ত বায়ুতে নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য। মদ, তামাক, গাঁজা প্রভৃতি খাইলে রক্তের শ্বেতকণিকা ও লোহিতকণিকাগুলি নষ্ট হয়। তাহার ফলে রক্তের জোর কমিয়া যায়। যাহাতে রক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় এইরূপ কোন প্রকার খারাপ খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিবে না।

৬। শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গমনের যন্ত্র

মানব-দেহকে একখানা গতিশীল ইঞ্জিনের (locomotive) সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইঞ্জিনখানা চালাইবার জন্য চালককে যেমন জল ও কয়লা দিতে হয়, তেমনি উহার মধ্য হইতে অঙ্গার, ছাই প্রভৃতি বাহির করিতে হয়, উহার কলকব্জা-গুলি মাঝে মাঝে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কৃত করিতে হয়। এই অঙ্গার ও ছাই বাহির না করিলে বা ইঞ্জিনখানা পরিষ্কৃত না করিলে উহা অনতিবিলম্বে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। মানবদেহ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ইঞ্জিনে যেমন জল ও কয়লা দেওয়া হয়, সেইরূপ প্রতিদিন আমরা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করি। শরীর এইগুলির সারপদার্থ গ্রহণ করে, কিন্তু অসার পদার্থগুলি থাকিয়া যায়। আবার, প্রতিমুহূর্ত্তে শরীরের ক্ষয় হইতেছে। ইহা হইতেও কতকগুলি দূষিত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই দূষিত পদার্থ শরীরের মধ্যে থাকিয়া গেলে শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হইবে। এই নিমিত্ত ভগবান্ এই দূষিত পদার্থগুলি দেহ হইতে নির্গত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেহের যে যন্ত্রগুলি দূষিত পদার্থগুলি বাহির করিয়া দেয়, তন্মধ্যে (১) ফুসফুস্, (২) মূত্রগন্থি (kidney) (৩) চর্ম্ম এবং (৪) বৃহৎ অন্ত্র প্রধান।

১। **ফুসফুস্**।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রক্ত শরীরের দূষিত পদার্থগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসে, হৃৎপিণ্ড এই দূষিত রক্ত শোধনের জন্য ফুস্ফুসে প্রেরণ করে। আমরা যখন প্রশ্বাস

গ্রহণ করি, তখন ফুস্‌ফুস্‌ বায়ু হইতে অম্লজান গ্রহণ করে, রক্ত এই অম্লজান পাইয়া শোধিত হয় এবং ইহার দূষিত পদার্থগুলি পরিত্যাগ করে। এই দূষিত পদার্থগুলি নিঃশ্বাস-বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া নির্গত হয়। এই নিমিত্ত নিঃশ্বাসবায়ু দূষিত।
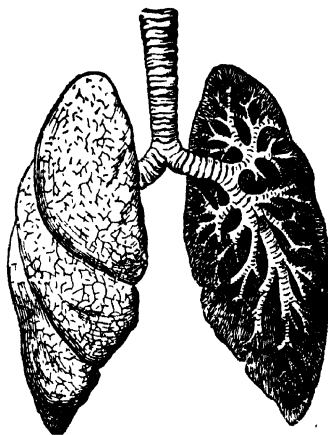
ফুস্‌ফুস্‌
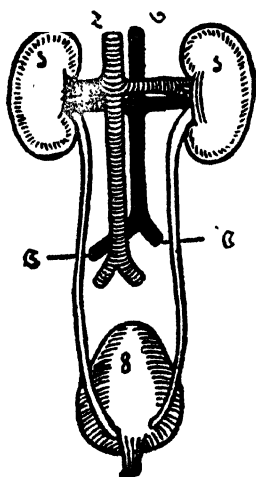
(১) বৃক্কক (kidney) (২) ধমনী (artery) (৩) শিরা (vein) (৪) মূত্র-থলি (bladder) (৫) মূত্রনালী (ureter)

(২) মূত্রগ্রন্থি (kidney) :—পাকস্থলীর গহ্বরের পিছন দিকে মেরুদণ্ডের ডানদিকে একটি ও বামদিকে একটি যন্ত্র আছে—উহারা বক্রাকৃতি। উহাদের নাম বৃক্কক। এই যন্ত্র দুইটির কার্য্য শরীরের দূষিত পদার্থগুলি নির্গত করা। যখন এই মূত্রগ্রন্থি দুইটির মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়, তখন উহারা রক্ত হইতে জলের সহিত দূষিত পদার্থগুলি পৃথক্‌ করিয়া মূত্ররূপে বাহির করিয়া দেয়।

একটি নলের (ureter) দ্বারা মূত্রাশয় (bladder) নামক আর একটি থলিয়ার মত যন্ত্রের সহিত মূত্রগ্রন্থির সংযোগ থাকে। যে মূত্র উৎপন্ন হয় তাহা ঐ নল দিয়া গমন করিয়া মূত্রাশয় বা মূত্রথলিতে সঞ্চিত হয়। মূত্রথলি ভরিয়া উঠিলে প্রস্রাবের বেগ হয় এবং তখন আমরা ঐ দূষিত পদার্থ-সংযুক্ত জল প্রস্রাবরূপে ত্যাগ করিয়া থাকি।

সুস্থ অবস্থায় একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রতিদিন ৪০ হইতে ৬০ আউন্স মূত্র ত্যাগ করে। শরীর সুস্থ থাকিলে আমরা যে মূত্র ত্যাগ করি তাহার বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ বা জলের মত স্বচ্ছ থাকে। প্রস্রাবের রং লাল বা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ হইলে বুঝিতে পারা যায়, আমরা শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় অল্প পরিমাণ জল খাইয়াছি। জ্বর হইলে মূত্রাশয়ের কার্য্য বৃদ্ধি হইবে, এই নিমিত্ত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির ঘন ঘন জল পান করা উচিত। প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে এবং তাহার সহিত দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। দূষিত পদার্থগুলি বাহির হইতে না পারিলে উহারা শরীরে আবদ্ধ থাকিয়া রোগ বৃদ্ধি করে। অনেক ব্যাধিতে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

গ্রীষ্মকালে চর্ম্ম হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম বাহির হয়। কিন্তু মূত্রগ্রন্থি অল্প পরিমাণে মূত্র পরিত্যাগ করে। শীতকালে ঘর্ম্ম কম হয়; মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

মদ, তামাক, অতিরিক্ত ঝাল ইত্যাদি খাইলে মূত্রাশয়ের

অনিষ্ট হয়; সুতরাং উহা খাইবে না। মূত্রের বেগ ধারণ করা আদৌ উচিত নহে। মূত্র ত্যাগ করিয়া প্রস্রাবের দ্বার ধৌত করা উচিত।

(৩) **চর্ম্ম।**—আমাদের দেহের বহিরাবরণ চর্ম্ম—ইহাতে আমাদের দেহ ঢাকা। ইহা আমাদের দেহকে রক্ষা করে। চর্ম্মের দুই স্তর আছে—একটি উপরের স্তর (epidermis) এবং অন্যটি নীচের স্তর (dermis)। যখন ফোস্কা পড়ে
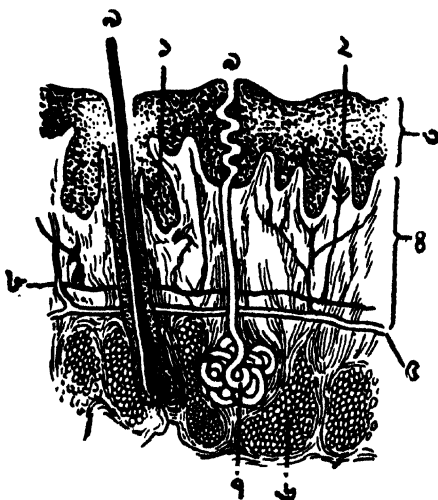
চর্ম্ম কাটিলে, অণুবীক্ষণ দ্বারা এইরূপ দেখা যায়
(১) ও (২) দুই প্রকার স্নায়ুপ্রান্ত। (৩) মৃত উপত্বক্ (৪) ত্বক্ (প্রকৃত চর্ম্ম)
(৫) ধমনী (৬) মেদকোষ (৭) ঘর্ম্মস্রাবী গ্রন্থি (৮) স্নায়ু (৯) ঘর্ম্মরন্ধ্র

তখন ফোস্কার জল এই দুই স্তরের মধ্যখানে থাকে। চর্ম্মের উপরের স্তরে এক প্রকার রং (pigment) থাকে, এই রংএর

তারতম্য অনুসারে লোকের শরীরের বিভিন্ন রং হয়। এই রং বেশী থাকিলে বর্ণ কাল, এবং কম থাকিলে বর্ণ সাদা হয়। রৌদ্র লাগিলে এই রং-এর আধিক্য হয়। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক কৃষ্ণবর্ণ।

চর্ম্মের নীচের স্তরে অনেক গ্রন্থি (gland) আছে (চিত্রে ৭)। এই গ্রন্থি হইতে চর্ম্মের উপরের স্তর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল চলিয়া গিয়াছে (চিত্রে ৯)। এইগুলিকে ঘর্ম্মকূপ বলে। চর্ম্মগ্রন্থি হইতে শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত হয়। ইহাকে আমরা ঘর্ম্ম বলি। ঘর্ম্মের মধ্যে জল ব্যতীত লবণ ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ থাকে।

মূত্রাশয় এবং চর্ম্ম যদি এই প্রকারে দূষিত পদার্থগুলি বাহির করিয়া না দিত, তাহা হইলে দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত বিষেই আমাদের মৃত্যু হইত। চর্ম্ম একাই দেহের বহু দূষিত পদার্থ নির্গত করে। যদি চর্ম্মে রং মাখাইয়া ঘর্ম্মকূপের মুখগুলি বন্ধ করা যায়, তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জীবন নাশ হইবে। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেহ হইতে কিরূপে ঘর্ম্ম বাহির হয় তাহা তোমরা দেখিয়াছ। আমরা যখন ঘর্ম্ম দেখিতে পাই তখনই মনে করি আমরা ঘামিতেছি। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা না দেখিলেও প্রতিমুহূর্ত্তেই দেহ হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইতেছে। কখন কখনও ইহা এত ধীরে ধীরে বাহির হয় যে, সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্প হইয়া অদৃশ্য হয়। তখন আমরা ঘর্ম্ম দেখিতে পাইনা। গরমে এবং ব্যায়াম করিলে ঘর্ম্ম বেশী হয়। সুতরাং প্রত্যহ ব্যায়াম করা উচিত।

শরীরে ময়লা জমিয়া যাহাতে ঘর্ম্মকূপগুলির মুখ বন্ধ না হয়, সে জন্য প্রত্যহ স্নান করা উচিত। খস্‌খসে গামছা দিয়া গা মাজিয়া ফেলা উচিত। মাঝে মাঝে সাবান ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষেও ব্যবস্থামত স্নান করা প্রয়োজন। ঘর্ম্ম-কূপের মুখ বন্ধ হইলে আরোগ্যলাভ করা তাহার পক্ষে আরও কঠিন, কারণ দূষিত পদার্থগুলি শরীরের মধ্যে থাকিয়া বিষের ন্যায় ক্রিয়া করিবে। এই নিমিত্ত গরম জলে খস্‌খসে গামছা ভিজাইয়া ভালরূপে চিপিয়া রোগীর দেহ বেশ করিয়া মুছিয়া দিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে; তাহা হইলে রোগীর দেহে ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা থাকিবে না। সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে —পরিষ্কার কাপড়-চোপড় ব্যবহার করিবে। অপরিচ্ছন্ন থাকিলে দাদ, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি কুৎসিত চর্ম্ম রোগ হয়।

৪। **বৃহৎ অন্ত্র**।—বৃহৎ অন্ত্র যে ভুক্তদ্রব্যের অসার অংশ মলরূপে দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মল বাহির হইতে না পারিলে বিবিধ রোগের সৃষ্টি করে।

৭। স্নায়ুমণ্ডলী

তুমি একটি কমলালেবু দেখিলে। উহা খাইতে তোমার ইচ্ছা হইল। তখন তুমি উহা লইয়া খাইতে আরম্ভ করিলে। স্কুলের ছুটির ঘণ্টা হইল, আর তুমি বাড়ী রওনা হইলে। এইরূপ আমরা কত জিনিষ দেখি, কত বিষয় ভাবি। কখনও আনন্দ, কখনও দুঃখ হয়। কখনও খেলি, কখনও পড়ি—

এইরূপ কোন-না-কোন কার্য্য করি। ইহা কিরূপে সম্ভবে? আমাদের দেহের মধ্যে এমনই বন্দোবস্ত আছে যে, আমরা কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারি, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভব করিতে পারি, কোন কার্য্য করিতে পারি। স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়াপদ্ধতি আমাদিগকে চিন্তা করিতে, সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে এবং কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করে।

দেহে বহু যন্ত্র আছে এবং উহাদের নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে। পাকস্থলী খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিতেছে, মূত্রগ্রন্থি দেহের দূষিত পদার্থ নির্গত করিতে সাহায্য করিতেছে, হৃৎপিণ্ড রক্ত সরবরাহ করিতেছে। যদি বিভিন্ন যন্ত্রগুলি নিয়মিতরূপে ইহাদের কার্য্য না করে, তবে দেহ অসুস্থ হয় এবং মৃত্যু ঘটে। দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করাও স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য।

স্নায়ুমণ্ডলীর তিনটি অংশ; যথা.—(১) মস্তিষ্ক (brain) (২) মেরুরজ্জু (Spinal cord) এবং (৩) স্নায়ুতন্তু (nerves)।

(১) মস্তিষ্ক।—মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থিত। ইহার দুইটি প্রধান অংশ:—(ক) বৃহৎ মস্তিষ্ক (Cerebrum) এবং (খ) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (Cerebellum)। বৃহৎ মস্তিষ্ক উপরে এবং তাহার নীচে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক
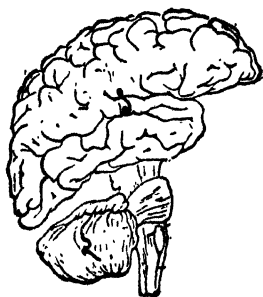
১। বৃহৎ মস্তিষ্ক ২। ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক।

অবস্থিত। আমরা যে ভাবি, সুখ-দুঃখ অনুভব করি বা কোন কার্য্য করি, তাহা কে করায় জান? ইহা প্রধানতঃ মস্তিষ্কের কাজ। ইহার উপরিভাগ সমতল নহে—ঢেউতোলা। যে ব্যক্তি যত বুদ্ধিমান্, যত চিন্তাশীল, তাহার বৃহৎ মস্তিষ্ক তত ঢেউতোলা। কোন লোকের বৃহৎ মস্তিষ্ক দেখিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কার্য্য হইল দেহকে সোজা অবস্থায় রাখা। উহা আক্রান্ত হইলে, আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা হাঁটিতে পারি না। মদ খাইলে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়, এই জন্য মাতালেরা টলিতে থাকে।

(২) মেরুরজ্জু। এই মস্তিষ্কের ভিতর হইতে উৎপন্ন স্নায়ুসকল বড় একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া নামিয়া গ্রীবাদেশ দিয়া দীর্ঘ রজ্জুর মত বরাবর মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই রজ্জু মেরু-প্রদেশের হাড়ের ভিতর দিয়া নিম্নে চলিয়া গিয়াছে, বলিয়া ইহার নাম মেরুরজ্জু। আমাদের মেরুদণ্ড কতকগুলি অস্থির সংযোগে গঠিত। ইহার একখানা আর একখানার উপর বসিয়া মেরুদণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহাদের মধ্য দিয়া বরাবর একটি দীর্ঘ ছিদ্র চলিয়া গিয়াছে। এই ছিদ্রের মধ্যে মেরুরজ্জু অবস্থিত।

মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু গ্রীবাদেশে যাহা দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে তাহাকে 'মেডুলা অব্লঙ্গেটা' (Medulla oblongata) বলে। ইহার কার্য্য বড় গুরুতর। ইহা কাটিয়া দিলে বা ফাঁসের দ্বারা চাপিয়া ধরিলে লোকের তখনই মৃত্যু হয়।

(৩) **স্নায়ুতন্তু**।—মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু হইতে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত রহিয়াছে। স্নায়ুতন্তুর কার্য্য ঠিক টেলিগ্রাফের তারের মত সংবাদ প্রেরণ করা। স্নায়ুতন্তু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—(১) অন্তর্মুখী (afferent or sensory nerve এবং (২) বহির্মুখী (efferent or motor nerve)। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেছি। তোমার হাত আগুনে পড়িল। হাতে যে সব অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তু আছে তাহা তখনই সে সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরণ করিল—তুমি যন্ত্রণা অনুভব করিলে। মস্তিষ্ক হইতে তখনই বহির্মুখী স্নায়ু-তন্তুর সাহায্যে আদেশ প্রেরিত-হইল—তুমি হাত সরাইলে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং শরীরের ঊর্দ্ধ ও অধঃ অঙ্গের সহিত স্নায়ুতন্তুদ্বারা মস্তিষ্কের সংযোগ আছে। আবার, মেরুরজ্জু হইতে বহু স্নায়ুতন্তু শরীরের ভিতর ছড়াইয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্কই মানবের বুদ্ধি-বৃত্তির আধার। আমাদের অধিকাংশ চিন্তা, অনুভূতি এবং কার্য্য
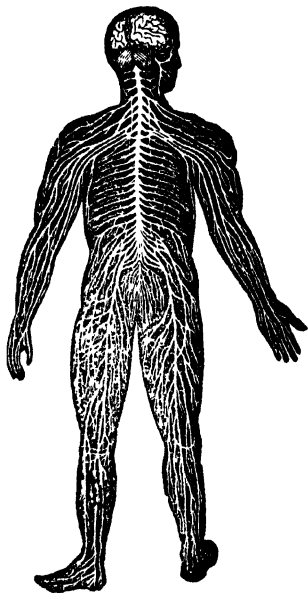
মনুষ্য-শরীরে স্নায়ুতন্তু ;
মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু হইতে অসংখ্য স্নায়ুতন্তু সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত রহিয়াছে।

মস্তিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সকল স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্কের সহিত সোজা সংযুক্ত আছে, মস্তিষ্ক তাহার আদেশ তাহাদের মধ্য দিয়া সোজা প্রেরণ করে। যে সকল স্নায়ুতন্তু মেরুরজ্জু হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহাদের দ্বারা সংবাদ প্রেরণের কার্য্য মেরুরজ্জুর মারফত চলে। অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্তু মেরুরজ্জুতে সংবাদ দেয়, মেরুরজ্জু সে সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে, তাহার আদেশ মেরুরজ্জুর নিকট পাঠায় এবং মেরুরজ্জু তখন সেই আদেশ বহির্মুখী স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে যথাস্থানে প্রেরণ করে। সুতরাং মস্তিষ্ক যেন বড় আফিস (head or central office), আর মেরুরজ্জু যেন তাহার অধীন ছোট আফিস। আবার, কতকগুলি ছোট ছোট কার্য্যের ভার মেরুরজ্জুর উপর ন্যস্ত থাকে—মস্তিষ্কের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হয় না।

৮। ইন্দ্রিয়

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটি আমাদের ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ইহাদের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি। কোন জিনিষ কিরূপ তাহা চক্ষু দ্বারা দেখি, কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনি, নাসিকার দ্বারা গন্ধ পাই, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন পাই এবং ত্বকের সাহায্যে কোন বস্তু শক্ত কি নরম, শীতল কি উষ্ণ ইত্যাদি বিষয় বুঝিতে পারি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা—এই চারিটি ইন্দ্রিয় স্নায়ু-তন্তুর দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত আছে। চর্ম্ম দ্বারা স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জুর সহিত মিলিত রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়গুলির মোটামুটি গঠন ও কার্য্য-প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চক্ষু

চক্ষু দেখিতে গোলাকার এবং নাসিকার দুই পার্শ্বে দুইটি গহ্বরে অক্ষিগোলকদ্বয় অবস্থিত। চক্ষুর সম্মুখে অতি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ আবরণ আছে। ইহাকে কর্ণিয়া (Cornea) বলে (চিত্রে ১)। এই কর্ণিয়ার পিছনে আমরা যাহাকে চক্ষুর মণি বলি তাহা অবস্থিত (চিত্রে ৪)। এই মণি বা কণীনিকা মাংসপেশীর দ্বারা এমন ভাবে আবদ্ধ যে আমরা ইহাকে আলোক-সাহায্যে
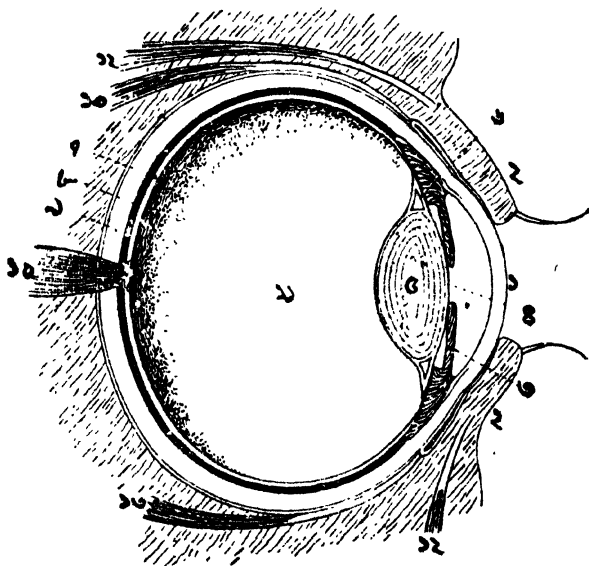
চক্ষুর বিভিন্ন অংশ

সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিতে পারি। উজ্জ্বল আলোকে এই মণি সঙ্কুচিত এবং মৃদু আলোকে প্রসারিত হয়। এই মণির

পশ্চাতে ফটোগ্রাফারের ক্যামেরার মত আতসকাচ (lens) লাগান আছে (চিত্রে ৫)। আমরা চক্ষুর মণি এমন ভাবে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারি, যাহাতে কোন জিনিষের ছায়া এই কাচের উপর ঠিকমত পতিত হইতে পারে। যে জিনিষের ফটোগ্রাফ তুলিতে হইবে তাহার ছায়া যাহাতে ক্যামেরার লেন্সের উপর সুস্পষ্ট ভাবে পতিত হয়, সেজন্য ফটোগ্রাফার তাহার ক্যামেরার বাক্সটি সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করে। অক্ষিগোলকের পশ্চাৎভাগে ছায়াপট (Retina) নামক একটি পর্দ্দা আছে। ইহা যেন ফটোগ্রাফের ক্যামেরার প্লেটের অনুরূপ। ঐ ছায়াপট হইতে কতকগুলি স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্কে চলিয়া গিয়াছে (চিত্রে ১০)। যখন আমরা কোন দ্রব্য দেখি, তখন নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে। কণিয়া ভেদ করিয়া আলোক-রশ্মি চক্ষুমণির ভিতর দিয়া লেন্সের উপর পতিত হয়। পরে চক্ষুমণির সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বারা ছায়াপটের উপর জিনিষটির সঠিক ছায়াপাত করে। তখন এই স্নায়ুতন্তুগুলির সাহায্যে এই ছায়ার বিবরণ মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং এই সময়েই প্রকৃত পক্ষে আমরা ঐ জিনিষটি দেখিতে পাই। সুতরাং চক্ষু বহির্জগতের জিনিষ উপলব্ধি করিবার দ্বারস্বরূপ—প্রকৃত পক্ষে, আসল দেখার কার্য্য মস্তিষ্ক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। উপরি-উক্ত চক্ষু ও মস্তিষ্ক সংযোগকারী স্নায়ুতন্তুগুলি (optical nerves) যদি কাটিয়া দেওয়া যায়, তবে চক্ষুর আর দেখিবার ক্ষমতা থাকে না। অতি সহজেই চক্ষু বিনষ্ট হইতে পারে।

এই নিমিত্ত ভগবান্ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, ময়লা প্রবেশ করিবার উপক্রম হইলে চক্ষুর পাতা এবং লোমগুলি বাধা দেয়। আবার, ভ্রূ থাকায় কপালের ঘর্ম্ম চক্ষুতে প্রবেশ করিতে পারে না।

যত ইন্দ্রিয় আছে তাহার মধ্যে চক্ষু প্রধান। আমরা দেখিয়া কোন জিনিষ সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি, অন্য কোন ভাবে তত পারি না। চক্ষুর সাহায্যেই আমরা আলোক, বর্ণ, আকার প্রভৃতির ধারণা করিতে পারি। দৃষ্টিশক্তি ভালরূপ না থাকিলে কোন কাজ করা কঠিন। যে অন্ধ সে নিতান্তই হতভাগ্য; আর, যাহার দৃষ্টিশক্তির দোষ থাকে তাহারও বিশেষ কষ্ট।

সাধারণতঃ দৃষ্টিশক্তির **দুই প্রকার দোষ** দেখা যায়। কেহ দূরের জিনিষ ভালরূপে দেখিতে পায়, কিন্তু নিকটের জিনিষ তেমন ভাল দেখিতে পায় না (long sight)। আবার, কেহ নিকটের জিনিষ ভাল দেখে, কিন্তু দূরের জিনিষ ভাল দেখেনা (short sight)। দৃষ্টি শক্তির এইরূপ কোন দোষ হইলেই বিজ্ঞ চিকিৎসককে চক্ষু দেখাইয়া ঔষধ বা চশমা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত দৈনন্দিন জীবনে আমাদের এমন ভাবে চলা উচিত যেন চক্ষুর কোন অনিষ্ট না ঘটে। **নিম্নলিখিত উপদেশ অনুসারে সর্ব্বদা কাজ করিবে ঃ—**

(১) মৃদু এবং অতি প্রখর আলোকে কখনও পড়িবে না

বা সেলাই প্রভৃতি কার্য্য করিবে না। অতি মৃদু এবং অতি প্রখর আলোক—দুই-ই চক্ষুর পক্ষে অনিষ্টকর।

(২) পড়িবার সময় এমন ভাবে বসিবে যেন আলো বাম দিক্ হইতে আসে। লণ্ঠন বা প্রদীপ কখনও সম্মুখে বা ডানদিকে রাখিবে না।

(৩) যে পুস্তক পড়িবে তাহার অক্ষর যেন অতিক্ষুদ্র এবং তাহার লাইনগুলি অতি ঘন ঘন না হয়। পুস্তক বড় এবং স্পষ্ট অক্ষরে ছাপা হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন শব্দ ও লাইনের মধ্যে যথোচিত ফাঁক থাকা উচিত।

(৪) পড়িবার সময় পুস্তকখানা অতি নিকটে বা অতি দূরে রাখিবে না। বইখানা এমন ভাবে ধরিবে বা রাখিবে যেন পাঠ্য বিষয় চক্ষু হইতে দেড় ফুট দূরে থাকে।

(৫) একযোগে কিছুক্ষণ পড়িবার পর চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য।

(৬) চক্ষুতে কোন ময়লা প্রবেশ করিলে চক্ষু ডলিও না—পরিষ্কার সিদ্ধ জল দ্বারা উহা ধুইয়া ফেলিবে (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(৭) অন্যের ব্যবহৃত গামছা, রুমাল প্রভৃতি ব্যবহার করিও না। তাহার চক্ষুর ব্যাধি থাকিলে উহা তোমাকেও আক্রমণ করিতে পারে। কাহারও চক্ষুর ব্যারাম হইলে তাহার সহিত মেশামেশি করিও না।

(৮) দৃষ্টিশক্তির কোনরূপ দোষ বুঝিলেই অভিজ্ঞ চিকিৎসককে উহা দেখাইবে। সময়মত চশমা লইলে দৃষ্টিশক্তির

দোষ সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেবল বাবুগিরির জন্য কখনও চশমা ব্যবহার করিও না উহাতে ভাল চক্ষু খারাপ হইয়া থাকে।

কর্ণ

কর্ণের দ্বারা আমরা শ্রবণ করি। ইহা তিন অংশে বিভক্ত—বহিঃকর্ণ (outer ear), মধ্যকর্ণ (middle ear) এবং অন্তঃকর্ণ (inner ear)।
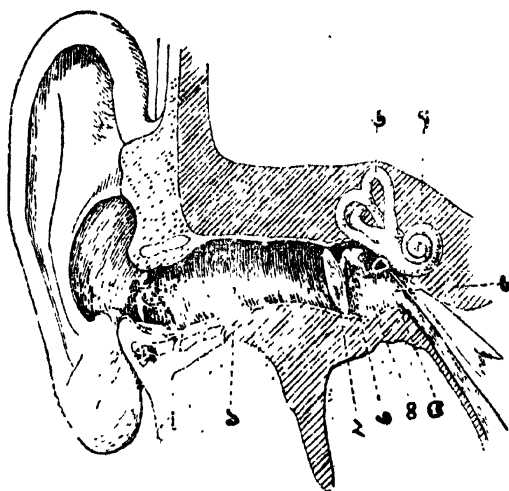
কর্ণের অংশ

১। কানের বাহিরের ছিদ্রপথ; ২। কর্ণ-পটহ; ৩। পটহে সংযুক্ত অস্থি; ৪। ঐ অস্থি দ্বিতীয়টি; ৫। ঐ অস্থি তৃতীয়টি; ৬,৭। কর্ণের অভ্যন্তরের যন্ত্র-বিশেষ; ৮। কর্ণের মধ্যমাংশ।

কর্ণের যে অংশ আমরা বাহিরে দেখি ইহাই বহিঃকর্ণ। ইহার আকৃতি একটি ঠোসের (funnel) মত। ইহার কার্য্য হইতেছে

শব্দকে গ্রহণ করা। ইহা হইতে মধ্যকর্ণ পর্য্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। এই সুড়ঙ্গের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোম আছে, উহা কোন কীট বা ধূলাবালি কর্ণে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে। এই সুড়ঙ্গের প্রান্তে এবং মধ্যকর্ণের মাঝখানে একটি ঝিল্লি আছে। ইহাকে কর্ণের পটহ (drum) বলে। বাহিরে কোন শব্দ হইলে, তাহা কর্ণের সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিয়া এই পটহে আঘাত করে। মধ্য-কর্ণের মধ্যে তিন খানা অস্থি আছে। উহার একখানা হাতুড়ির (hammer) মত, একখানা নেহাইর (anvil) মত, ও একখানা পা-দানির (stirrup) মত আকৃতি-বিশিষ্ট। পটহের অপর দিকে এই মধ্যকর্ণ হইতে একটি ক্ষুদ্র নল (Eustachian tube) মুখবিবর (throat) পর্য্যন্ত গিয়াছে। অন্তঃকর্ণ একখানা অস্থির মধ্যে একটি গহ্বরে অবস্থিত। এখান হইতে কতকগুলি স্নায়ুতন্তু (auditory nerves) মস্তিষ্কে চলিয়া গিয়াছে। যখন আমরা কোন শব্দ শুনি তখন নিম্নলিখিত ঘটনা ঘটে ঃ—শব্দ বহিঃকর্ণের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া পটহে আঘাত করে, মধ্যকর্ণ সেই শব্দ অন্তঃকর্ণে প্রেরণ করে এবং সেখান হইতে স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে উহা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়।

অতি সহজেই কর্ণের অনিষ্ট হইতে পারে; এই নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অন্ধেরও যেমন দুঃখ, বধিরেরও তেমন দুঃখ। কাণে কম শুনিলে জীবনে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কর্ণের ব্যাধির সুচিকিৎসা না করিলে

শ্রবণশক্তি হ্রাস হইতে পারে, এমন কি, বধিরতা আসিতে পারে।

নিম্ন-প্রদত্ত উপদেশগুলি সর্ব্বদা মনে রাখিবে।—

(১) কাণ পাকিলে বা অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে অবিলম্বে চিকিৎসা করাইবে।

(২) অত্যন্ত জোরে শব্দ করিলে, কাণে আঘাত করিলে, এমন কি, জলে বেশী ডুবাইলে কর্ণের পটহ ছিঁড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। কর্ণের পটহ ছিঁড়িলে লোকে বধির হয়। সুতরাং কখনও কাণের কাছে মুখ আনিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিও না। কাহারও কর্ণে আঘাত করিও না।

(৩) কাণের ভিতরে কাঠি দিয়া খৈল বাহির করিতে চেষ্টা করিও না। কারণ, পটহে আঘাত লাগিয়া উহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। কাণের খৈল অতি সাবধানতা-সহকারে পরিষ্কার কাপড়ের সলিতার দ্বারা পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিবে। যদি খৈল শুষ্ক হইয়া কর্ণের প্রদাহ উৎপাদন করে তবে দুই ফোটা স্পিরিট দিয়া রাখিলেই ঐ খৈল গলিয়া বাহির হইবে।

(৪) ছেলেরা অনেক সময় শ্লেট-পেন্সিল, মটর কলাই বা কোন ছোট ফল বা ফলের বীজ কাণের ছিদ্রের সম্মুখে দিয়া রাখে। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

(৫) কাণে কোন পোকা প্রবেশ করিলে কাণে ঈষৎ উষ্ণ সরিষার তৈল অথবা জল দিয়া উহা বাহির করা যায়। কোনরূপ খোঁচাখুঁচি করিতে নাই।

নাসিকা

নাসিকার দ্বারা আমরা প্রশ্বাস গ্রহণ করি, নিঃশ্বাস ত্যাগ করি এবং যে-কোন বস্তুর ঘ্রাণ প্রাপ্ত হই। নাসিকার গহ্বর একটি প্রাচীরের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের প্রত্যেক ভাগ হইতে ছিদ্র চলিয়া গিয়াছে; ইহাকে নাসারন্ধ্র বলে। নাসারন্ধ্রের উপরের অংশ হইতে কতকগুলি স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্কে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে গন্ধবাহক স্নায়ুতন্তু (oldfactory nerve) বলা হয়। কোন দ্রব্যের গন্ধযুক্ত অণু নাসিকায় প্রবেশ করিয়া এই স্নায়ুতন্তুগুলিকে আঘাত করে, এবং উহারা উহা মস্তিকে প্রেরণ করে। এইরূপে আমরা কোন দ্রব্যের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হই।

জিহ্বা

জিহ্বার গঠন-প্রণালী এবং পরিপাক-কার্য্যে ইহার ক্রিয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জিহ্বার দ্বারা আমরা কোন জিনিষের আস্বাদ বুঝিতে পারি। জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উভয় কিনারায় আস্বাদ গ্রহণের যন্ত্রগুলি (papillae) অবস্থিত। এইগুলি হইতে স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্কে চলিয়া গিয়াছে। যখন আমরা কোন জিনিষ ভালরূপে চর্ব্বণ করি, তখন এই স্নায়ুতন্তুগুলির সাহায্যে মস্তিষ্ক উহার স্বাদ অনুভব করিতে পারে।

ত্বক্

চর্ম্মের গঠন-প্রণালী এবং দেহ হইতে দূষিত পদার্থ কিরূপে চর্ম্ম-পথে নির্গত হয় তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ত্বকের

সাহায্যে আমরা কোন জিনিষ স্পর্শ করিতে পারি। ন
পরেই স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্থান। আমরা একটি জিনিষ দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পারি, তাহার পর সে-টি স্পর্শ করিয়া সে সম্বন্ধে অধিকতর ভাল ধারণা জন্মে। অন্ধ লোকে স্পর্শ করিয়া কিরূপে জিনিষ বুঝিতে পারে তাহা তোমরা জান। এই দুই ইন্দ্রিয়ের একত্র সমাবেশ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়। একটি জিনিষ দেখিয়া এবং তাহা স্পর্শ করিয়া যে ধারণা হয় তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

কোন জিনিষ নরম কি শক্ত, মসৃণ কি খস্‌খসে, উষ্ণ কি শীতল তাহা এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝিতে পারি। চর্ম্ম হইতে অনেক স্নায়ুতন্তু মস্তিষ্ক এবং মেরুরজ্জুতে চলিয়া গিয়াছে। বহির্জগতের জিনিষ এই চর্ম্মের সংস্পর্শে আসিলে স্নায়ুতন্তুগুলি তাহাদের অনুভূতি মস্তিষ্ক বা মেরুরজ্জুতে প্রেরণ করে, এবং আমরা উহার বিষয় জানিতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যকতা

বায়ুর প্রয়োজনীয়তা।—আমাদের জীবন ধারণ করিবার জন্য বিশুদ্ধ খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সূর্য্যালোকের যেমন প্রয়োজন, বিশুদ্ধ বায়ুর তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। অন্যান্য দ্রব্য না হইলেও কতক সময়ের জন্য জীবন ধারণ করা সম্ভবপর, কিন্তু বায়ু গ্রহণ করিতে না পারিলে কোন প্রাণী জীবন ধারণ করিতে পারে না। তোমরা যদি একটি ক্ষুদ্র পাখীকে একটি কাচপাত্রে রাখিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দাও তবে দেখিতে পাইবে কিছু কাল পরে পাখীটি নিস্তেজ ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছে এবং ক্রমে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ অবস্থায় যদি ঐ কাচপাত্রের মুখ খুলিয়া বিশুদ্ধ বায়ুতে রাখিয়া দাও তবেই দেখিতে পাইবে, ঐ পাখীটি ক্রমে জীবন ফিরিয়া পাইতেছে।

বায়ুর উপাদান এবং উহাদের কার্য্য।—বায়ু আমরা দেখিতে পাই না। বাতাস যখন শরীর স্পর্শ করে তখন আমরা ইহা অনুভব করি। বিশুদ্ধ বায়ুর কোন গন্ধ নাই। বায়ু কয়েকটি উপাদানে গঠিত; যথা,—

অম্লজান (Oxygen)………… ২০.৯৯ অংশ
নাইট্রোজেন (Nitrogen)……… ৭৮.৯৭ ”
অঙ্গার-অম্লজান (Carbonic Acid)….৪ ”

ইহা ছাড়া, বায়ুতে জলীয় বাষ্প, এমোনিয়া গ্যাস, এবং ওজোন নামক গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। বায়ু বলিলে যদিও আমরা একটিমাত্র পদার্থ বুঝিয়া থাকি, কিন্তু উপরিউক্ত পরিমাণে ঐ সকল উপাদানে গঠিত বায়ুকে আমরা বিশুদ্ধ বায়ু বলি। কিন্তু এই প্রকার বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া কঠিন, কারণ বায়ুতে সর্ব্বদাই ধূলা-বালি ও নানাবিধ জান্তব পদার্থের সূক্ষ্ম কণা ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং এইগুলির দ্বারাই বায়ু দূষিত হইয়া থাকে।

অম্লজান অতি তীব্র গ্যাস। ইহার কার্য্য দহন করা। যখন আগুন জ্বলে, তখন অগ্নি বায়ু হইতে এই অম্লজান গ্রহণ করে। এই অম্লজান না পাইলে আগুন জ্বলে না। এই নিমিত্ত বাতাসের পথ রুদ্ধ হইলে আগুন নির্ব্বাপিত হয়; অপর পক্ষে, বাতাস পাওয়ার সুযোগ পাইলে আগুন ভাল জ্বলে। এই নিমিত্ত পাখা দিয়া বাতাস দিলে নির্ব্বাপিত-প্রায় আগুনও পুনরায় অম্লজান পাইয়া জ্বলিয়া উঠে। আমরা শ্বাসগ্রহণকালে বায়ুর এই অম্লজান গ্রহণ করি। এই অম্লজান আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে দহন-ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া শক্তি উৎপাদন করে। এইরূপে শরীরের উত্তাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু বায়ুতে যদি কেবল এই অম্লজানই থাকিত, তবে উহা গ্রহণের অনুপযুক্ত হইত। কারণ, শুধু অম্লজান গ্যাস দেহে প্রবেশ করিলে শরীরের পেশীসমূহ পুড়িয়া যাইত, জীবন ধারণ করা অসম্ভব হইত। এই নিমিত্ত নাইট্রোজেন

গ্যাস উহার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া উহার তীব্রতা কমায় এবং বায়ুকে গ্রহণযোগ্য করে।

বায়ু ভূ-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নিম্নস্তরে অবস্থিত বায়ু উপরের স্তরের বায়ু অপেক্ষা ভারি বা ঘন। বায়ু যখন দহন ক্রিয়াদ্বারা ক্রমে হাল্‌কা হইয়া পড়ে এবং দূষিত হয়, তখন উহা ক্রমে উর্দ্ধগামী হয়। এই নিয়মে বায়ুর প্রবাহ চলিতেছে। বিশুদ্ধ বায়ুর ভিতরেও প্রতি ১,০০০ ভাগে ৪ ভাগ পরিমিত অঙ্গার-অম্ল গ্যাস থাকে। দহনকার্য্য ও পচনক্রিয়া দ্বারা, এবং কুয়াশাদ্বারা বায়ুস্থিত অঙ্গার-অম্ল গ্যাস (Carbon dioxide) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার, উদ্ভিদাদির অবস্থিতি দ্বারা, বৃষ্টির দ্বারা, প্রবল ঝটিকার দ্বারা এবং ঘরে বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত রাখায় উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া থাকে। জীবগণের জীবন ধারণের জন্য যেমন অম্লজান বাষ্পের (Oxygen) প্রয়োজন, সেইরূপ গাছ-গাছড়ার জীবন ধারণের জন্য অঙ্গারাম্লজান বাষ্পের (Carbon dioxide) প্রয়োজন। সূর্য্যরশ্মির সহযোগে বৃক্ষপত্রের সবুজ অংশ (Chlorophyll) অঙ্গার-অম্লজান বাষ্পকে বিভক্ত করিয়া উহার অঙ্গারের অংশ গ্রহণ করে এবং তৎসঙ্গে অম্লজান বাষ্পকে ত্যাগ করে ; এজন্য বায়ুস্থ অম্লজানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই প্রকারে বৃক্ষশ্রেণী প্রতিদিন বায়ুকে শোধন করিয়া দিতেছে।

অবিশুদ্ধ বায়ু সেবনে বিপদ্‌।—আমাদের সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। আমরা নাসিকা দ্বারা শ্বাস টানিলে

উহা ফুস্‌ফুসে গিয়া উপস্থিত হয়। ফুস্‌ফুসে বায়ুকোষের (air cells) উপর অতি সূক্ষ্ম দুইটি আবরণ থাকে। একটি আবরণে কোষের বায়ুমণ্ডলকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার উপরিস্থ আর একটি আবরণে রক্তনালীসকল জালের ন্যায় ঘিরিয়া অবস্থিত আছে। এবংবিধ উভয় সূক্ষ্ম আবরণ মিলিয়া $\frac{১}{৫০০}$ হইতে $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চিমাত্র পুরু হয়। অতএব বায়ু-কোষস্থিত বায়ু এবং রক্তনালীস্থিত রক্ত উভয়ে মিলিত না হইলেও তাহারা নামমাত্র আবরণ দ্বারা পৃথক্। এই জন্য বায়ুকোষস্থিত বায়ু এবং রক্তনালীস্থিত রক্তের উপাদানে আদান-প্রদান অতি সহজেই হইয়া থাকে।

দূষিত বায়ু টানিয়া লইলে নানাবিধ দূষিত পদার্থ আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং রক্তকে দূষিত করে। বায়ুর সহিত যদি ধূলা-বালি, রোগের বীজাণু ইত্যাদি থাকে, তবে এইরূপ দূষিত বায়ু শরীরে প্রবেশ করিলে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানি, সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি ব্যাধি হয়। যে বায়ু জীবন ধারণের জন্য এত প্রয়োজনীয়, তাহা দূষিত হইলে মারাত্মক ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া জীবন নাশের কারণ হইতে পারে; সুতরাং যাহাতে দূষিত বায়ু সেবন করিতে না হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ভ্রমণে, বিশ্রামে ও নিদ্রায়—সর্ব্বসময় বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

কিরূপে বায়ু দূষিত হয়।—নানাকারণে বায়ু দূষিত হয়, যথা,—

(ক) **প্রশ্বাস**।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস বায়ুর একটি উপাদান। এই গ্যাস অতি বিষাক্ত। বিশুদ্ধ বায়ুতে ইহার পরিমাণ অতি সামান্য থাকে। বায়ুতে ইহার পরিমাণ বেশী হইলে বায়ু দূষিত হয়। আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি, তখন ঐ বায়ুর মধ্যে অক্সিজেন বেশী থাকে। কিন্তু নিঃশ্বাস-বায়ুতে অক্সিজেন খুব কম বাহির হয়, এবং অধিক পরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস নির্গত হয়। এক স্থানে বহুলোক সমবেত হইলে তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ুর অক্সিজেন কমে এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বেশী হয়। কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বায়ুতে বেশী থাকিলে মাথাঘুরা, মাথাধরা প্রভৃতি ব্যাধির সৃষ্টি করে; এমন কি, উহার মাত্রা বেশী হইলে উহা মানুষের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। ঘেষাঘেষি করিয়া বসিলে বা শয়ন করিলে গা বমি বমি করা, .মাথাধরা প্রভৃতি উপসর্গ হয়। কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাসের আধিক্যই এই অসুখের কারণ।

(খ) **জ্বলন** (Combustion)।—আগুন জ্বলিলে, অগ্নি বায়ু হইতে অক্সিজেন টানিয়া লয়; সুতরাং যত বেশী আগুন জ্বলিবে, বায়ুর অক্সিজেন তত কমিয়া যাইবে। অতএব, ঐ দূষিত বায়ু প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে আমাদের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। আগুন জ্বালাইলে, বা কাষ্ঠাদি পোড়াইলে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের উৎপত্তি হয়। তোমরা হয়ত শুনিয়া থাকিবে, পূর্ব্বে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া পোর্টার বা চৌকিদার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর চাকরদের জন্য যে

ইষ্টক নির্ম্মিত ছোট গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন, তাহাতে পরিমিতরূপ বাতাস খেলিবার ব্যবস্থা থাকিত না। এজন্য শীতকালে ঐরূপ ঘরে আগুন জ্বালিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করায় অনেকের প্রাণ নাশ হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব মনে রাখিবে, রুদ্ধ ঘরে কখনও শয়ন করিবে না, বা অগ্নি জ্বালিয়া বা বাতি জ্বালিয়া ঘরে শয়ন করিবে না; কারণ, তাহা হইলে অম্লজান নামক বায়ুর যে প্রধান উপাদান আমরা প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি তাহা অগ্নি সহযোগে কমিয়া যাইবে এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইবে।

(গ) **পচন-ক্রিয়া।** কোন গাছপালা, লতাপাতা, জীবজন্তু পচিলে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। পচা পায়খানা, নর্দ্দমা প্রভৃতি হইতে যে দুর্গন্ধ বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা বায়ুর সহিত মিশিয়া বায়ুকে দূষিত করে। এই সকল দূষিত বাষ্প নানাবিধ কঠিন পীড়ার সৃষ্টি করে। গৃহের চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনা থাকিলে তাহা পচিয়া বায়ু দূষিত করে এবং ঐ স্থান অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে। যেখানে সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না, জল জমিয়া থাকে, সেইখানে জিনিষ পচিবার সুযোগ পায়। এই নিমিত্ত সেঁতসেঁতে ভূমি, গোরস্থান, শ্মশান, কসাইখানা, পচা ডোবা প্রভৃতি স্থানের বায়ু দূষিত হয়।

(ঘ) **ধূলিকণা ও রোগ-বীজাণু।**—যদি অন্ধকার গৃহে সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করে, তবে উহার মধ্যে অসংখ্য ধূলিকণা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে

নানাপ্রকার রোগ বীজাণু, শুষ্ক কফ বা কাসির অংশ, অপরবিধ পূয-উৎপাদক বীজাণু, তুলা, পাট, শণ, কয়লা এবং চূণের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড থাকিতে পারে। এই সব ময়লায় ক্ষয়কাশ, বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির বীজাণু লুকাইয়া থাকিতে পারে এবং ঐ বায়ু গ্রহণ করিলে ঐ সকল ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দূষিত বায়ু কিরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে -সাধারণতঃ চারি প্রকারে দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। বেগে বাতাস বহিলে দূষিত বায়ু শীঘ্র পরিষ্কৃত বায়ুর সহিত

মিলিত হওয়ায় দুর্গন্ধ দূর হইয়া যায়। বৃষ্টি হইলে বায়ুস্থিত ধূলিকণা এবং রোগের বীজাণুসকল জলের সহিত ভূমিতে পড়িয়া যায়।

আমরা যে দূষিত বায়ু নাসিকা দ্বারা বহির্গত করি উহাতে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বেশী পরিমাণে থাকে, আবার দিনের বেলা সূর্য্যকিরণে বৃক্ষপত্রের সবুজ পদার্থ ঐ কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের কার্ব্বন বা অঙ্গারভাগ টানিয়া লয় এবং বিশুদ্ধ

অম্লজান গ্যাস বায়ুর মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু রাত্রিতে তাহার বিপরীত ক্রিয়া হয়। এতদ্‌ব্যতীত সূর্য্যকিরণে কোনও বীজাণু বাঁচে না বলিয়া খোলা যায়গার হাওয়া শীঘ্র শুদ্ধ হইয়া যায়।

বৃহৎ জলাশয়, নদী ও সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে বায়ু ও জলের সংস্পর্শে অধিক পরিমাণে শক্তিশালী অম্লজানের সৃষ্টি হয়। এজন্য ঐ সকল স্থান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া পুরী, ওয়াল্‌টেয়ার প্রভৃতি স্থানে লোকে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে যায়।

এখন বুঝিতেছ, (১) বেগবান্ বায়ুর দ্বারা, (২) বৃষ্টির দ্বারা এবং (৩) সূর্য্যকিরণ ও (৪) বৃক্ষ-পত্রের দ্বারা **প্রাকৃতিক উপায়ে** বায়ু বিশুদ্ধ হইতে পারে। গৃহের নিকট বৃক্ষাদি থাকিলে উহা দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করিতে পারে। বৃষ্টির উপর আমাদের কোন হাত নাই। কিন্তু **বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া** আমরা বায়ু বিশুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

দূষিত বায়ুর দ্বারা কি কি ব্যাধি হইতে পারে

একস্থানে বহুলোক বাস করিলে বা বন্ধ ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া বহুলোক থাকিলে বায়ুর অম্লজান হ্রাস পায় এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রথমতঃ গরম বোধ হয়; তারপর ক্রমে ক্রমে হাই-উঠা, মাথাঘোরা, শ্বাস-কষ্ট, শিরঃপীড়া, অচৈতন্যতা, এমনকি, মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই প্রকারেই অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল। ক্রমাগত বহু দিন ধরিয়া দূষিত বায়ু সেবন করিলে দেহাভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ অম্লজানের অভাবহেতু দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতে পারে না; বরং উহা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া, বায়ুর ধূলাবালি, রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাপানি, সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি ব্যাধির সৃষ্টি করে।

পচা নর্দ্দমার দুর্গন্ধ বাষ্পপূর্ণ বায়ু সেবন করিলে জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগ হইতে পারে।

দূষিত বায়ুজনিত ব্যাধি নিবারণের উপায়।—

দূষিত বায়ু সেবনে যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে হইলে—

১। দূষিত বায়ু শোধন করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

২। ঘরের জানালা উন্মুক্ত রাখিয়া শয়ন করা উচিত।

৩। কখনও লেপ মুড়ি দিয়া, বা এক মশারির মধ্যে বহু লোক শয়ন করা উচিত নয়।

৪। শয়নঘরে আলো বা আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া ঘুমান উচিত নয়।

৫। রোগীর ঘরে সর্ব্বদা বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

৬। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্থ রোগীর দেহনিঃসৃত রোগ-বীজাণু যাহাতে বায়ুতে বিস্তৃত হইতে না পারে, তজ্জন্য রোগীর দেহনিঃসৃত মল ও তাহার কাপড়-চোপড় বিশোধক দ্রব্য দ্বারা শোধন করা উচিত।

৭। দুর্গন্ধ নিবারণ করিলে বায়ুজনিত ব্যাধির প্রকোপ নিবারিত হয়।

বায়ু-প্রবাহ

যে কোন উপায়ে কোন স্থানের দূষিত বায়ু সরাইয়া দিয়া সেই স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত করাকে বায়ুপ্রবাহ (ventilation) বলে।

আকাশস্থ বায়ু সর্ব্বদাই প্রবহমান। তাহার কারণ, সূর্য্যের কিরণ ও নানাবিধ দহন-ক্রিয়াদ্বারা বায়ু উত্তপ্ত হয় এবং ঐ উত্তপ্ত বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়ায় ঊর্দ্ধদেশে গমন করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মনুষ্যদেহে দহন-কার্য্যজনিত উৎপন্ন অঙ্গার-অম্লজান বাহিরের বাতাসে আসিয়া মিলিত হয়। এইরূপে যে সকল দহনকার্য্য সর্ব্বদা পৃথিবীর উপর ঘটিতেছে তাহাদ্বারা উত্তপ্ত হইয়া বায়ু ঊর্দ্ধমুখে চলিতেছে। স্বভাবতঃ, ত্রিবিধ প্রক্রিয়াদ্বারা বায়ু-প্রবাহ চলিতে থাকে ; যথা,—

(১) বায়ুমধ্যস্থিত নানাবিধ বাষ্প ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে এবং একে অন্যের সহিত মিশিয়া থাকে।

(২) উত্তপ্ত বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং উহাদের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী, অপেক্ষাকৃত শীতলবায়ু ঐ স্থানে যায়।

(৩) বেগবান্ বায়ু (যেমন ঝটিকা) দুর্গন্ধময় বাষ্প সকলকে পচনশীল দ্রব্য হইতে সরাইয়া লইয়া যায় এবং বিশুদ্ধ বাতাস তথায় আনিয়া দেয়।

বায়ু-প্রবাহদ্বারা ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য পরিমিত দরজা জানালা রাখা দরকার। এই দরজা জানালা এমন ভাবে রাখিতে হইবে যেন ঘরে বাতাস ঢুকিয়া উহা সমস্ত ঘরে ঘুরিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। ঘরে সূর্য্যকিরণ যাইবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন; কারণ, সূর্য্যরশ্মির দ্বারা বায়ু শোধিত হইয়া থাকে। ঘরে প্রবাহিত বায়ু যদি বাহিরের বায়ুর ন্যায় বিশুদ্ধ হয়, তবে বায়ুপ্রবাহের দ্বারা উত্তম কার্য্য চলিতেছে, বুঝিতে হইবে। ঘরের বায়ু-প্রবাহ ঠিক রাখিতে হইলে প্রত্যেক অধিবাসী হিসাবে ছয় শত ঘন ফুট স্থান থাকা দরকার এবং এই স্থানের ভিতর যথাপরিমিত দরজা জানালা থাকা আবশ্যক। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবর্ষে কুত্রাপি এইরূপ ব্যবস্থা করিতে দেখা যায় না এবং এই কারণেই ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে বহু সহস্র লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ইহার অর্দ্ধেক যায়গাও রাখা হয় না। আবার, পর্দ্দানশীন মহিলাদিগের জন্য

ইহা অপেক্ষা অল্প জায়গা দেওয়া হয়। এজন্য মহিলাদিগের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, স্বাভাবিক রোগ-নিবারণক্ষমতা অতি অল্প এবং তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। যদি জনপ্রতি, ঘণ্টায় তিন হাজার ঘনফুট বায়ু সরবরাহ করা যায়, তবে ঐ বায়ু বিশুদ্ধ থাকিতে পারে। একটি ঘরের বায়ু ঘণ্টায় তিন বারের বেশী বদলাইতে দিবে না। কারণ, এরূপ বারে বারে বাতাস বদলাইতে দিলে উহার প্রবাহ বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য ১০০০ ঘন ফুট জায়গা হইলেই চলিবে। কিন্তু এতটা স্থানও সকল সময় ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় না; এজন্য অন্ততঃ ৫০০ ঘন ফুট স্থান দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবার ৯০ বর্গ ফুট পরিমিত স্থান আবশ্যক। কিন্তু এই স্থানও ৪৮ বর্গ ফুট হইলে চলিতে পারে।

শয়নঘরে বায়ু-প্রবাহ—আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা জীবনের ⅓ অংশ সময় ঘুমাইয়া কাটাই এবং এই অবস্থায় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হইলে আমাদের বিশেষ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। অনেকে রাত্রিতে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকে। ইহার ফলে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না এবং দূষিত বায়ুও বাহিরে যাইতে পারে না। এজন্য আবদ্ধ বায়ুই পুনঃ পুনঃ প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় এবং সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিলে বুঝিতে পারে, শারীরিক শ্রান্তি দূর হয় নাই, শরীর ভার ভার বা ম্যাজম্যাজ বোধ

হইতেছে এবং কার্য্যে কোন প্রকার উৎসাহ আসিতেছে না। অতএব, আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত যে, শয়নঘরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অথচ ঠাণ্ডা বা প্রবল বায়ু প্রবাহিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এরূপ ব্যবস্থা করিলে সুনিদ্রা হইবে এবং প্রত্যূষে উঠিলে কার্য্যে উৎসাহ লাগিবে। সর্ব্বদাই শয়নঘরের উপরের জানালা খোলা রাখিয়া শয়ন করিবে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক গায়ে কাপড় দিয়া বারান্দায় শয়ন করিয়া থাকে। সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এরূপ শয়ন অপেক্ষাকৃত ভাল।

শিশুদের জন্য সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ুর বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ইহার অভাবে উহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শিশুদিগকে যতক্ষণ সম্ভব মুক্ত বাতাসে রাখিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা খেলিয়া বেড়াইতে চাহিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্ত বাতাসে খেলা করিতে দিবে। বৃদ্ধদিগের জন্যও প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন। এজন্য তাঁহারাও যথাসম্ভব ঘরের বাহিরে থাকিবেন। অতিরিক্ত উত্তপ্ত ঘরে, অথবা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঘরে তাঁহারা বাস করিবেন না। উভয় অবস্থাতেই তাঁহাদিগের সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

স্কুলগৃহে যাহাতে প্রত্যেক বালক-বালিকা পরিমিতরূপ বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এজন্য স্বাস্থ্য-বিভাগের নির্দ্দিষ্ট পরিসরবিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠে ৩০ জন ছাত্রের অধিক থাকা সঙ্গত নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

মাংসপেশীর কার্য্য এবং যথোচিত অঙ্গসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা

মাংসপেশী।—অস্থির উপর এবং চামড়ার নীচে দেহের যে নরম অংশ আছে তাহার নাম মাংসপেশী। জীবিত প্রাণীর মাংস-পেশী দেখিতে লাল। মানবদেহে পাঁচশতের অধিক মাংসপেশী আছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি বড়, কোনটি ছোট। আবার, ইহাদের আকৃতিরও পার্থক্য আছে—কোনটি গোলাকার, কোনটি দীর্ঘাকার।

মাথার খুলি—পর্দ্দা ও মাংস দ্বারা সংরক্ষিত

মাংসপেশীর কার্য্য।—তোমার বাহু উপর দিকে কনুইয়ের কাছে বাঁকা কর, যেন বাহুখানা দুই ভাঁজ হয়। দেখ, মাংসপেশীগুলি কিরূপে ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই মাংসপেশীর সাহায্যেই হাতখানি বাঁকা করিতে পারিয়াছ। মাংসপেশীর প্রধান কার্য্য হইতেছে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি চালনা করা (movement of the limbs)।

মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়া (by contraction) বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির গতিবিধি সৃষ্টি করে। মাংসপেশীর সাহায্যেই আমরা হাঁটিতে পারি, দৌড়াইতে পারি, এবং ভারি জিনিষপত্র তুলিতে পারি। যখন আমরা আহার করি, তখন মুখের মাংসপেশীর সাহায্যেই আমরা মুখ ব্যাদান এবং চর্ব্বণ করিতে
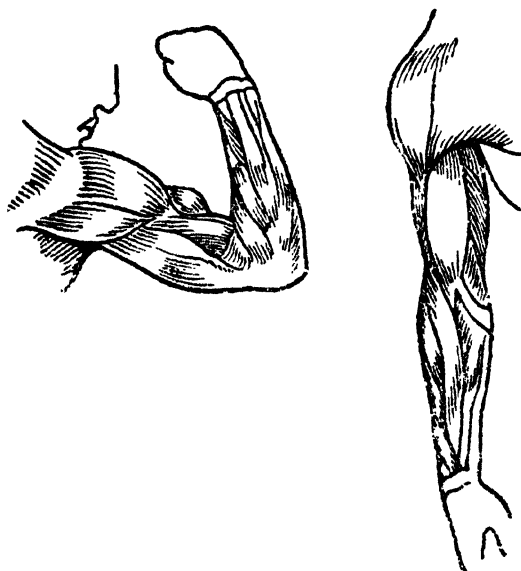
পারি। এইরূপ দৈনিক জীবনের অধিকাংশ কার্য্যই মাংসপেশীর সাহায্যে করিয়া থাকি। যখন আমরা হাঁটি, কেবল তখনই যে মাংসপেশী কার্য্য করে তাহা নহে, আমরা যখন দাঁড়াইয়া থাকি বা বসিয়া থাকি তখনও মাংসপেশীর সঙ্কোচনের উপর আমাদের উপরি-উক্ত কার্য্যগুলি নির্ভর করে।

মাংসপেশীর শ্রেণীবিভাগ।—মাংসপেশীর কার্য্যের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) **ইচ্ছাধীন** (voluntary) এবং (২) **ইচ্ছামুক্ত** (involuntary)

কতকগুলি মাংসপেশীর কার্য্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমার ইচ্ছা হইল দৌড়াইলাম, হাত উঠাইলাম বা নামাইলাম; আবার ইচ্ছা হইলে—চুপ করিয়া রহিলাম। যে মাংসপেশীর সাহায্যে এই শ্রেণীর কার্য্যগুলি সম্পাদিত হয় তাহাকে স্বেচ্ছাধীন (voluntary) মাংসপেশী বলা হয়। এই মাংসপেশীগুলি আমাদের ইচ্ছার দাস। আমরা যেরূপ ইচ্ছা করি, এই মাংসপেশীগুলির কার্য্য তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে। অভ্যাস দ্বারা ঐ মাংসপেশীর নাচন বা কম্পন (muscle-dancing) দেখান যায়।

অপর পক্ষে, এমন অনেক মাংসপেশী আছে, যাহাদের কার্য্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, তাহারা তাহাদেব কার্য্য নিয়মিতরূপে করিয়া যাইবে। আমাদের ইচ্ছামত তাহাদের কার্য্য হয় নাই, বা আমাদের ইচ্ছা-মত তাহাদের কার্য্য বন্ধও হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর কথা বলা যায়। এই মাংসপেশীর সাহায্যেই হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন (contraction) এবং প্রসারণ (dilation) কার্য্য চলিতেছে। আমরা ইচ্ছা করিলেই এই কার্য্য বন্ধ করিতে পারি না, আমাদের ইচ্ছামত হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীগুলি কার্য্য

আরম্ভ করে না। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখনও এই হৃৎপিণ্ডের কার্য্য চলিতে থাকে। যদি এই মাংসপেশীগুলির কার্য্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে মানুষ নিদ্রিত হইলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইত। এই শ্রেণীর মাংস-পেশীকে ইচ্ছামুক্ত (involuntary) বলা হয়। ফুস্‌ফুস্, অন্ত্র, রক্তবাহিকা ধমনী, শিরার মাংসপেশী এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের কার্য্যগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত হইতেছে।

যথোচিত অঙ্গ-সংস্থানের প্রয়োজনীয়তা।—কতকগুলি মাংসপেশীর সঙ্কোচনের উপর আমাদের বসা, দাঁড়ান প্রভৃতি অঙ্গ-সংস্থান নির্ভর করে। আমরা যদি এমনভাবে দাঁড়াই বা বসি, যাহাতে এই সকল মাংসপেশীর উপযুক্ত পুষ্টি লাভের অসুবিধা হয়, তবে তাহার ফলে শরীরের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। অনেক লোক এমনভাবে দাঁড়ায় ও বসে যে, পৃষ্ঠের মাংসপেশী শিথিল হয়। তাহার ফলে তাহাদের পিঠ কুঁজো হয়। অতএব কিরূপে, বসিতে ও দাঁড়াইতে হয় তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

দাঁড়াইবার নিয়ম।—সোজা হইয়া, বুকটান করিয়া দুপায়ে সমান ভর দিয়া দাঁড়াইবে। মেরুদণ্ড যেন বেশ খাড়া থাকে। সম্মুখে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলে মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাইবে। দুই পায়ের উপর সমান ভর না পড়ায় পায়ের অস্থিও বক্র হইবে। বুকটান করিয়া না দাঁড়াইলে বুকখানি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বুক সঙ্কুচিত হইলে বুকের অস্থি-পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রগুলি যথাযথ ভাবে

কাজ করিতে পারে না এবং তাহাদের পূর্ণ পরিণতিও হয় না।

ছবিতে দেখ, দুইটি লোক দাঁড়াইয়াছে। একটি লোক দেখ কেমন ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পিঠের দাঁড়া বাঁকিয়া

গিয়াছে। তাহার হাত-পায়ে যেন বল নাই; বুক টান করিয়া দাঁড়াইবার শক্তিই তাহার নাই (১নং)। অপর লোকটি

কেমন মাথা সোজা রাখিয়া, বুক টান করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, তাহার দেহে বল ও সাহস আছে এবং মনে স্ফূর্ত্তি আছে (২নং)। দ্বিতীয় লোকটি ঠিকমত দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু প্রথম লোকটির দাঁড়ান ঠিক হয় নাই।

হাঁটিবার নিয়ম।—হাঁটিবার সময় দুই পায়ের উপর সমান ভর দিবে এবং শরীর সোজাভাবে টান রাখিয়া হাঁটিবে। ঘাড়, পিঠ ও কোমর কখনও বাঁকাইয়া হাঁটিও না। বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত হাঁটিবে। প্রাণহীন মানুষের মত হাঁটিও না। এইরূপে হাঁটিলে সহজে শরীরের ক্লান্তি বোধ হয় না এবং একবারে অনেক দূর হাঁটিতে পারা যায়।

এইরূপে হাঁটিবে না | এইরূপে হাঁটিবে।

বসিবার নিয়ম।—দাঁড়াইবার ও চলিবার দোষে যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকৃতি হয়,

বসিবার দোষেও সেইরূপ হয়। অতএব বসিবার সময় সতর্ক হইয়া বসিবে। চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পুস্তক রাখিয়া
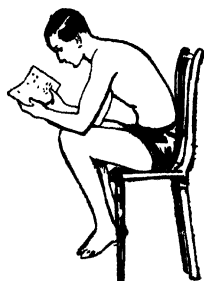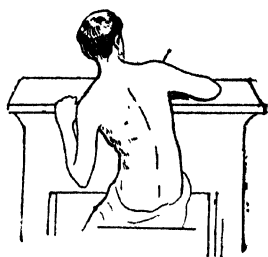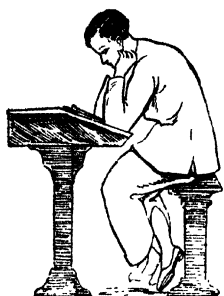
এই ভাবে বসিয়া পড়িবে না।

পড়িবার সময় কখন সম্মুখে, ডান দিকে বা বামদিকে ঝুঁকিয়া বসিতে নাই। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া পড়িলে ক্রমে ক্রমে মেরুদণ্ড বক্র হয় এবং চক্ষুর জ্যোতিঃও কমিয়া যায়।

অনেক বালক শরীর বাঁকাইয়া অস্বাভাবিকভাবে বসিয়া লেখাপড়া করে। এই কু-অভ্যাসের ফলে তাহাদের মেরুদণ্ড বক্র হইয়া যায়। আর, এরূপ ভাবে বসিয়া লিখিলে হাতের লেখাও ভাল হয় না। সুতরাং সর্ব্বদাই উঁচু টেবিলের উপর শরীর সোজাভাবে রাখিয়া লিখিবে। চক্ষু এবং পুস্তক বা খাতা অন্ততঃ ১৮ ইঞ্চি দূরে থাকিবে। এরূপ ভাবে পড়িলে চক্ষু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকেনা।
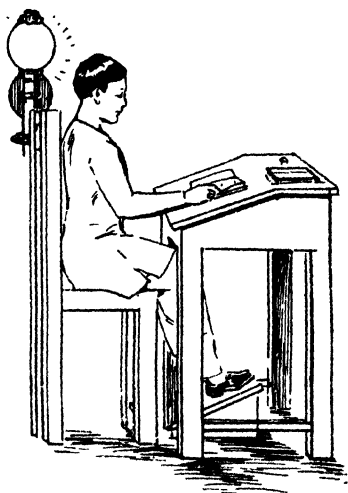
এইরূপে বসিবে

চেয়ারে পিঠ রাখিয়া বুক টান করিয়া বসিবে। চেয়ারে বসিলে এইভাবে বসিয়া পড়াশুনা করিও। যে চেয়ার এবং টেবিল তোমার পক্ষে খুব উচু বা নীচু, তাহা ব্যবহার করিও না। এমন চেয়ারে বসিবে যেন পা দুইখানি সোজা ভাবে মাটিতে থাকে এবং টেবিলের উপর তোমার কনুই দুইটি বেশ আরামে থাকে। মাটীতে মাদুর পাতিয়া লিখিতে বা পড়িতে হইলেও বুক টান করিয়া সোজা হইয়া বসিও। কখন ঝুঁকিয়া বসিও না।

শয়ন করিবার নিয়ম।—খুব উচু বালিশ ব্যবহার করিও না ; কারণ, উহাতে তোমার ঘাড়ের হাড় বক্র হইবে। অনেক বালক পা গুটাইয়া শয়ন করে। এরূপ করা উচিত নহে *। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে অনেক সময় বোবায় ধরে।

এই ভাবে শয়ন করিবে না

এই ভাবে শয়ন করিবে।

উপুড় হইয়া শয়ন করাও কু-অভ্যাস। ডান পার্শ্বে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডে অযথা চাপ পড়ে না, অথচ হজম-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

* আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে, শয়ন করিবার সময় প্রথমতঃ বামদিকে শুইয়া কয়েক মিনিট বিলম্ব করিয়া পরে ডান পার্শ্বে শয়ন করাই বিধেয়। এরূপ করিলে পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য হজম হইবার সুযোগ পায় এবং পরে তথা হইতে ক্ষুদ্র আন্ত্রে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা সুগম হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

আকস্মিক অনিষ্টপাত ও তাহার চিকিৎসা

দেহের কোন স্থানে হঠাৎ কটিয়া যাওয়া, হাত-পা ভাঙ্গা, আগুনে পোড়া, বৃশ্চিকাদি কাট-পতঙ্গের দংশন প্রভৃতি দুর্ঘটনা অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে। এই সকল ঘটনার অবিলম্বেই প্রতীকার করা আবশ্যক। কিন্তু সকল সময় নিকটে চিকিৎসক পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ তখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে সামান্য বিপদ্‌ও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এমন কি, তাহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই নিমিত্ত দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহার প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা করা উচিত সে সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

নিম্নে কতকগুলি আকস্মিক বিপদের প্রাথমিক ব্যবস্থার উল্লেখ করা গেল।—

শরীরের কোন স্থান থেঁতলাইয়া যাওয়া (bruises)।—হঠাৎ আছাড় পড়িয়া বা অন্য কোন প্রকারে আঘাত লাগিয়া শরীরের কোন স্থান থেঁতলাইয়া গেলে, চর্ম্মের উপরিভাগের খানিকটা উঠিয়া যায়। আহত স্থান প্রায় এক দিন পরে নীলবর্ণ ধারণ করে। ঐ স্থানে বরফ বা শীতল জল দিবে। বরফ বা শীতল জল না পাইলে রুমাল, গামছা, তূলা প্রভৃতি গরম জলে ভিজাইয়া উহা চিপিয়া ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ গরম জলে তূলা ভিজাইয়া সেঁক দিবে এবং পরে

পরিষ্কার বিশুদ্ধ গজ (gauge) দ্বারা ঐ থেঁতলান স্থান ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিবে। ঐ থেঁতলান স্থানে টিঞ্চার আইওডিন প্রয়োগ করিলেও খুব উপকার হয়।

কোন স্থান কাটিয়া গেলে তাহার চিকিৎসা।— কোন স্থান কাটিয়া গেলে কাটা জায়গায় বিশুদ্ধ তূলার সাহায্যে একটু টিঞ্চারআইওডিন লাগাইয়া দাও। তাহার পর উহাতে একটু বোরিক এসিড ছিটাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দাও। টিঞ্চার আইওডিন দিলে একটু জ্বালা করিবে, কিন্তু উহা বেশী ক্ষণ স্থায়ী হইবে না।

সামান্য ক্ষত হইলে একবার ঔষধ প্রয়োগেই কাজ হইবে। কিন্তু ক্ষত যদি বড় হয়, এবং যদি দ্বিতীয় দিন দেখা যায় যে, ক্ষতস্থানের চারিদিকের চামড়া লাল হইয়াছে এবং ফুলিয়াছে, তবে ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিবে। যদি পূঁয জন্মিয়া থাকে, তবে বোরাসিক এসিডের লোশন দ্বারা ঐ ক্ষত বেশ করিয়া ধুইবে। চায়ের পেয়ালার আধ পেয়ালা গরম জল লইয়া উহাতে ছোট চামচের এক চামচ বোরাসিক এসিড মিশাইলে ঐ লোশন প্রস্তুত হইবে। লোশন দ্বারা ঘা ধুইয়া, এক টুক্‌রা জলে সিদ্ধ করা বিশুদ্ধ কাপড় ঐ লোশনে ভিজাইয়া ক্ষত স্থানের উপর দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিবে। প্রত্যহ এরূপ করিলে ঘায়ের দোষ কাটিয়া যাইবে, পূঁয হইবে না, এবং ঘায়ের রং ক্রমে লাল হইয়া উঠিবে। পরে, ঐরূপ ভাবে দুই দিন রাখিলেই ঘা বিশ্রাম পাইবে এবং শুকাইয়া উঠিবে।

উপরের ঔষধ ব্যতীত আরও ঔষধ আছে। আধ পেয়ালা জলের মধ্যে কিছু পটাশ পার্ম্মেঙ্গানেট বা ১০।১২ ফোটা লাইজল (lysol) অথবা কার্ব্বলিক এসিড (carbolic acid) মিশাইয়া প্রয়োগ করিলেও সুফল পাওয়া যায়। গ্রামে টিঞ্চার আইও-ডিনের অভাব হইলে সদ্য গাঁদাফুলের পাতা অথবা বিলাতি লাউয়ের সদ্য উদ্‌গমিত ডগা বা আয়াপানের (বিশল্যকরণীর) পাতা বিশুদ্ধ জলে ধুইয়া থেঁতলাইয়া ঐ কাটা স্থানে বাঁধিয়া রাখিলেই কাটা স্থান প্রায় জোড়া লাগিয়া থাকে।

আঘাতজনিত রক্তস্রাব ও তাহা নিবারণের উপায়।— কোন স্থান কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে পারে। স্থানভেদ ও অস্ত্রাঘাতের গুরুত্ব অনুসারে রক্তস্রাব কমবেশী হইতে পারে। যে আঘাত পায়ে লাগিলে জীবনের কোন অনিষ্ট হইতে না পারে, সেই আঘাত কণ্ঠদেশে লাগিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে। সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাত স্থলে শীঘ্র শীঘ্র রক্ত বন্ধ করা দরকার, নতুবা রক্তস্রাব হেতু মৃত্যু ঘটিতে পারে। অতএব, রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ না করিয়া চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করিলে হয়ত মৃত্যু হইতে পারে। রক্তস্রাব বন্ধ করিবার কতকগুলি উপায় বলা হইতেছে :—

(১) রক্তস্রাব বেশী হইলে বা তাড়াতাড়ি না কমিলে, খুব শীতল জলে এক টুক্‌রা কাপড় ভিজাইয়া উহা কাটাস্থানে চাপা দাও। তবুও যদি রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তবে অঙ্গুলি বা একটি

কর্ক দিয়া সেই স্থান চাপিয়া ধরিবে। ক্ষতস্থানটি যে অঙ্গের উপর, তাহা তুলিয়া ধরিবে, যেন উহা হৃৎপিণ্ড হইতে উপরে থাকে।

(২) খুব দ্রুতবেগে রক্তস্রাব হইলে রোগীকে শোয়াইবে এবং কাটাস্থানের উপরে ও নীচে হাতের অঙ্গুলিদ্বারা চাপ দিবে। রক্ত বন্ধের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে ধমনী হইতে, কি শিরা হইতে রক্তস্রাব হইতেছে তাহা বুঝা উচিত। ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল ও লালবর্ণ, কিন্তু শিরার রক্ত ঘোরাল রঙের। ধমনীর রক্ত থামিয়া থামিয়া পিচকারীর ধারার মত বহির্গত হয়, কিন্তু শিরার রক্ত একভাবে নির্গত হয়। তোমরা পূর্ব্বে পড়িয়াছ যে, ধমনীর রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে আসে; কিন্তু শিরার রক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া যায়। সুতরাং কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া গেলে যদি ক্ষতস্থানের উপরের দিকে চাপ দিলে রক্ত বন্ধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ধমনী কাটা পড়িয়াছে। নিম্নের দিকে চাপ দিলে যদি রক্ত বন্ধ হয় তবে শিরা কাটা পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে।
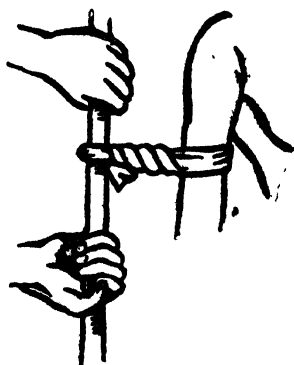
বাহু বা পায়ের গোছা কাটিয়া গেলে এবং উহা হইতে বেশী রক্তস্রাব হইলে, ক্ষতস্থান হইতে কিছু দূরে উপরে একখানা রুমাল বা কাপড়খণ্ড বাঁধ। তারপর, ঐ কাপড়ের মধ্যে একখানা যষ্টি দিয়া উহাদ্বারা কাপড় মোচড়াইয়া

কসিয়া বাঁধ। ইহাতে রক্ত বন্ধ হইবে। রক্ত বন্ধ হইলে ক্ষতস্থানে একটু টিঞ্চার আইওডিন দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে।

(৩) মুখমণ্ডল বা গ্রীবাদেশের কোন স্থান কাটিয়া বেশী স্রাব হইলে গলা চাপিয়া ধরিবে; তাহা হইলে মুখের রক্ত-প্রবাহ কমিয়া যাইবে এবং রক্ত-প্রবাহ বন্ধ হইবে।

(৪) ঠোঁট কাটিয়া রক্তস্রাব হইলে, হাত বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া আঙ্গুলদ্বারা কাটাস্থান চাপিয়া ধর, তাহা হইলে রক্ত বন্ধ হইবে।

(৫) কাঁধ এবং বগল হইতে রক্তস্রাব হইলে গ্রীবাদেশের সন্ধি-স্থলের অস্থির (collar bone) পশ্চাতে বৃদ্ধাঙ্গুলিদিয়া চাপিয়া ধর।

অগ্নি-দাহ।—দেহের কোন স্থানে সামান্য পরিমাণে অগ্নির উত্তাপ লাগিলে জ্বালা হয়। উহা সহজে নিবারণ করা যায়। কিন্তু বেশী পুড়িয়া ফোস্কা হইলে বা চামড়া পুড়িয়া ছাই হইলে, ক্ষত অতিশয় গুরুতর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কাপড়ে আগুন লাগিয়া এই প্রকারের দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। কাপড়ে আগুন লাগিলে লোকে কি করিবে বুঝিতে পারে না; তখন ভীত হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিলে আগুন আরও প্রবল হয়, এবং তাহার ফলে, দেহ আরও বেশী দগ্ধ হয়; সুতরাং আগুন লাগিলে কাপড় খুলিয়া ফেলিতে না পারিলে, ধীরভাবে মোটা কম্বল বা লেপ প্রভৃতি গায়ে জড়াইয়া বা আগুনের উপর চাপা দিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মাটিতে শয়ন করিয়া গড়াগড়ি করিলেও আগুন নিবিয়া যায়।

আগুনের ছাঁকা লাগিলে প্রথমতঃ অত্যন্ত জ্বালা হয়। তখন স্পিরিট দিলে জ্বালা নিবারিত হয়। দগ্ধস্থানে গোল

চট, কম্বল বা মোটা কাপড় আগুনের উপর চাপা দিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য (৭৯পৃঃ)।

আলু বাঁটিয়া বা চূণ ও নারিকেল তৈল মিশাইয়া বা ডিমের শ্বেতাংশ দিলে জ্বালার উপশম হয়। বেশী পুড়িলে কখনও ঠাণ্ডা লাগাইতে দিবে না এবং যাহাতে কোন প্রকারে বাতাসের সংস্পর্শ না হয় তাহা করিবে। দগ্ধস্থানে যে ফোস্কা উঠিবে তাহা প্রথম কটিয়া দেওয়া উচিত নহে। রোগী একটু সুস্থ বোধ করিলে, পরে উহা কাটিয়া মলম লাগাইবে এবং এমন ভাবে রাখিতে হইবে যেন কোন প্রকারে উহা দূষিত বায়ুর সংস্রবে না

আসে। ঘায়ের কাপড় বিশেষ সতর্কতার সহিত ছাড়াইতে হইবে, যেন কাপড় ছাড়াইতে যাইয়া চামড়া আরও ছিঁড়িয়া না যায়। কাপড় ঘায়ে আটিয়া গেলে, উহা বিশুদ্ধ গরম জলে সিক্ত করিলেই খুলিয়া যাইবে।

তিসির তৈল ও চূণের জল সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া খুব ফেনাইবে। তিসির তৈল না পাইলে রেড়ির তৈল ব্যবহার করিবে। তারপর এই চূণের জল মিশ্রিত তৈলে ন্যাক্‌ড়ার টুক্‌রা বা কলার পাতা ভিজাইয়া লইয়া ঈষৎ গরম অবস্থায় দগ্ধস্থানে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। দুই দিন পর প্রত্যহ একবার করিয়া ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া পরিষ্কার করিয়া কার্ব্বলিক এসিড বা বোরিক এসিড ঐ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া তদ্দ্বারা পুনরায় ব্যাণ্ডেজ করিবে।

অগ্নিদাহ বেশী হইলে কম্প, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ অনেক সময় প্রকাশ পায়। তখন অবস্থা শঙ্কটজনক মনে করিতে হইবে। এইরূপ স্থলে গরম চা, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক পানীয় পান করিতে দেওয়া উচিত। এইরূপ অবস্থায় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মত কাজ করিবে।

কণ্টক বিদ্ধ হওয়া।—দেহের কোনস্থানে কাঁটা বিঁধিলে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। লক্ষ্য করিবে, কাঁটার অগ্রভাগ ভিতরে রহিল কিনা। তৎপর ক্ষতস্থানে একটু টিংচার আইওডিন লাগাইবে। অভাবে, একটু লবণ ঐ বিদ্ধ স্থানে লাগাইলে উহার

রস টানিয়া লওয়ায় আর জ্বালা যন্ত্রণা হয় না। চূণ লাগাইয়া রাখিলেও প্রদাহ শীঘ্র শীঘ্র উপশমিত হয়।

শৃগাল কুকুর প্রভৃতি কর্ত্তৃক দংশন।—কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুতে দংশন করিলে ক্ষতস্থানের একটু উপরে কসিয়া বাঁধ দিবে, যেন সমস্ত দেহে বিষ ছড়াইতে না পারে। তৎপর ক্ষতস্থলে টিংচার আইওডিন লাগাইবে বা কষ্টিক বা তপ্ত লোহার দ্বারা উহা পোড়াইয়া দিবে।

যে কুকুর বা শৃগাল কামড়ায় তাহা যদি পাগল না হয়, তবে উপরি-উক্ত চিকিৎসায় রোগী নিরাপদ হইতে পারে। কিন্তু ঐ জন্তু ক্ষিপ্ত হইলে বিশেষ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। শৃগাল ও কুকুর ক্ষেপিয়াছে কিনা তাহা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ঃ—

(১) ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুর সর্ব্বদা অস্থির হইয়া বেড়ায়। (২) উহাদের স্বভাব খিট্‌খিটে হয়। (৩) উহারা মানুষ দেখিলে কামড়াইতে আসে, কখনও বা লুকাইয়া থাকিতে চায়। (৪) ঠাণ্ডা যায়গায় শুইতে ইচ্ছা করে। (৫) ক্রমে উহাদের গলা ফুলিয়া উঠে এবং মুখ হইতে লালা পড়িতে থাকে। লালাস্রাব আরম্ভ হইলেই প্রকৃত ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই লালাই বিষাক্ত এবং ইহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে মানুষের **জলাতঙ্ক** (Hydro-Phobia) রোগ হয়। সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে, ক্ষিপ্ত জন্তুর দাঁতে বিষ থাকে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। লালা রক্তের সহিত না মিশিলে,

বিষের কোন ক্রিয়া হয় না। দংশনের পর ১০ দিন যদি শৃগাল বা কুকুরটি জীবিত থাকে তবে ঐ জন্তুর দংশনে কোন ভয় থাকেনা।

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল মানুষকে কামড়াইলে জলাতঙ্ক রোগ হইতে পারে। দংশনের পর ১৪।১৫ দিন হইতে এক মাসের মধ্যে এই বিষের ক্রিয়া হইতে পারে। এই রোগ হইলে মানুষের শরীর ও মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না, সে সর্ব্বদাই ভয় পায়। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে। মাঝে মাঝে শরীরের কম্পন হয়। ঘাড় যেন আড়ষ্ট বোধ হয়। কখনও কখনও নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয় এবং শরীরে খেঁচুনি উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থা হইলে রোগের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রোগের পূর্ণবিকাশের অবস্থায় মুখ দিয়া লালা পড়িতে থাকে এবং উহা গিলিবার চেষ্টা করিলে বা জল খাইতে গেলে খেঁচুনি বৃদ্ধি হয় এবং রোগীর মুখ দিয়া একপ্রকার শব্দ বাহির হয়। ক্রমশঃ খেঁচুনি প্রবলতর হয়। রোগী পাগলের মত হয় এবং ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে চায়। পরে ২।৩ দিন এইভাবে থাকিয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগী জলপান করিতে গেলে তাহার এইরূপ খেঁচুনি উপস্থিত হয়; এমন কি, জল দেখিলে বা জলের নাম শুনিলেও এই ভাব বর্দ্ধিত হয়। এই নিমিত্ত এই ব্যাধিকে জলাতঙ্ক বলা হয়।

এই ভীষণ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য গভর্ণমেণ্ট কশৌলি, শিলং এবং কলিকাতায় চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। পাস্তুর (Pasteur) নামক এক মহাপুরুষ এই রোগের ঔষধ আবিষ্কার

করেন। তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালীতে ঐ সকল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা হইয়া থাকে। ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগালে দংশন করিলে যত শীঘ্র সম্ভব এই চিকিৎসালয়ে রোগীকে প্রেরণ করিবে। এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা যায়। দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে গভর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে এই পাস্তুর চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত জেলার এবং মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হয়। প্রত্যেক থানায় বা সহরে স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীদের নিকট উপস্থিত হইলে এবিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া থাকেন।

সর্পদংশন।—প্রতিবৎসর আমাদের দেশে বহু লোক সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাধারণতঃ বিষধর সর্পের উপরের পাটীতে দুইটি দীর্ঘ দন্ত থাকে। উহাদিগকে বিষ-দাঁত বলে। সর্প দংশন করিয়া এই বিষ-দাঁত হইতে বিষ ঢালিয়া দেয়। কেউটে, গোক্ষুর প্রভৃতি সর্পে দংশন করিলে মানুষ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। সর্পাঘাতের পরক্ষণেই চিকিৎসা করা প্রয়োজন। সময় থাকিতে যত্ন ও চেষ্টা করিলে অনেকস্থলে জীবন-রক্ষা হইতে পরে।

বিষধর সর্পে দংশন করিলে ক্ষতস্থানে o এইরূপ দুইটী ছিদ্র হয়। ঃ ঃ এইরূপ ছিদ্র হইলে বুঝিতে হইবে যে বিষধর সর্পে দংশন করে নাই বা বিষদন্ত প্রবেশ করায় নাই। বিষধর সর্পে দংশন করিলেই ক্ষতস্থানে পাতলা জলের ন্যায় রক্ত পড়িতে থাকে এবং তীব্র জ্বালা করে।

সর্পে দংশন করিলে রোগী ভয়ে অর্দ্ধমৃত হয়, এবং তাহার আত্মীয়স্বজনও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সময়ে মনের বল রাখা উচিত। রোগীকে সাহস দেওয়া উচিত। সর্পে দংশন করিবামাত্র ক্ষতস্থানের একটু উপরেই তাগা বাঁধিবে। ইহা এমন ভাবে বাঁধিবে যেন সর্পদষ্ট অঙ্গে রক্ত চলাচল করিতে না পারে। প্রথম তাগার উপর আর একটি তাগাও বাঁধা উচিত। এই আকস্মিক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের দেশে ছেলে-মেয়েদের মাজায় তাগা ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ নিয়মটির প্রচলন কমিয়া আসিতেছে। অতএব, ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া প্রত্যেকে ঐ তাগা ব্যবহার করিবে। পরে ক্ষতস্থানের চারিদিকে ছুরি দিয়া চিরিয়া দিবে এবং অনবরত গরম জলের ধারা দিবে। ইহার ফলে বিষ বাহির হইয়া আসিবে। ক্ষতস্থানের মধ্যে কিছু পার্ম্মেঙ্গানেট অব্ পটাশ্ প্রবেশ করাইয়া দিলে সুফল পাওয়া যায়। উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকিয়া চিকিৎসা করাইতে হইবে। একটি মুরগীর পিছে ক্ষত করিয়া ঐ ক্ষতস্থানে লাগাইলে অল্পক্ষণের ভিতর মুরগীটি মরিয়া যাইবে। এই প্রকারে ২০।২৫টি মুরগী ক্রমান্বয়ে লইয়া চিকিৎসা করিয়া দেখা গিয়াছে
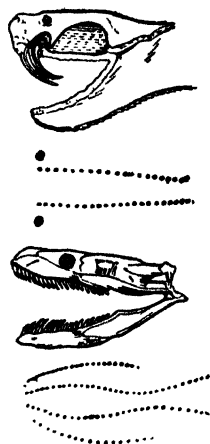
যে, ক্রমে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় পরে মুরগী মরিতে থাকে এবং শেষে প্রায় আধঘণ্টার মধ্যেও আর মরিতে দেখা যায় না। এইরূপ অবস্থায় রোগীর সর্পবিষ নষ্ট হওয়ায় তাহাকে বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

বৃশ্চিক-দংশন।—বিছায় কামড় দিলে ক্ষতস্থানে জ্বালা হয় ও ঐস্থান ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে হাত দিলে গরম বোধ হয়। দংশন করিলে ক্ষতস্থানে সূঁচ দ্বারা বিশেষ করিয়া খোঁচাইবে। তৎপর এই ক্ষতস্থানে কিছু পার্ম্মেঙ্গানেট অব্ পটাস্ অথবা চূণ লাগাইবে। একটি পিঁয়াজ কাটিয়া ক্ষতস্থানে ঘষিলেও উপকার হয়। জলে লবণ গুলিয়া উহা দিলেও ফল পাওয়া যায়।

মৌমাছি বা বোলতার দংশন।—অনেকগুলি মৌমাছি বা বোলতা একসঙ্গে দংশন করিলে রোগীর অবস্থা খারাপ হইতে পারে। এরূপ স্থলে প্রথমে তাহাকে কিছু উত্তেজক ঔষধ খাওয়ান উচিত। হুলগুলি বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। ক্ষতস্থানে অডিকোলন বা ভিনিগার লাগাইবে। অভাবে চূণ অথবা চিটাগুড় (যে গুড়ে তামাক মাখা হয় তাহা) লাগাইবে।

বিষ-ভক্ষণ।—(১) বিষভক্ষণ করিলে, উহা কত পরিমাণ উদরস্থ হইয়াছে সম্ভব হইলে তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। উহা জানিতে পারিলে চিকিৎসার সুবিধা হয়। রোগীর ভক্ষিত বিষ যদি তীব্র এসিড্ বা ক্ষতকারক বিষ না হয়, তবে রোগীকে বমন

করানোর চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিবিধ প্রকারে বমন করান যাইতে পারে। গলায় আঙ্গুল বা পালক প্রবেশ করাইলে বমি হইতে পারে। বড় এক গেলাস জলের সহিত এক চামচ সরিষার গুড়া বা মাষ্টার্ড (mustard) মিশাইয়া খাওয়াইলে বমি হইতে পারে। একবার বমি হইলে প্রত্যেক ৫ মিনিট অন্তর এইরূপ ঔষধ খাওয়াইবে। অবিলম্বে সুচিকিৎসক আনাইবে।

(২) সিন্দুর এক প্রকার বিষ। উহা উদরস্থ হইলে ডিমের শ্বেতাংশ বা ময়দা জলে গুলিয়া খাওয়াইলে এই বিষের ক্রিয়া নষ্ট করে।

(৩) সেঁকো বিষ উদরস্থ হইলে প্রথমতঃ বমি করাইবার চেষ্টা করিবে এবং পরে কাঁচা ডিম অথবা ময়দা জলে গুলিয়া খাইতে দিবে।

(৪) আফিম, গাঁজা, ধুতুরা প্রভৃতি বিষ উদরস্থ হইলে নিদ্রার আবেশ হয়। তাহা নিবারণ করিবার জন্য খুব কড়া চা বা কাফি খাইতে দিবে, এবং যাহাতে ঘুম না অসে, সে জন্য রোগীকে ইতস্ততঃ হাঁটাইবে। প্রথমতঃ বমি করাইয়া বিষ যতদূর সম্ভব বাহির করিয়া দিবে।

(৫) করবী ফুলের বীচি এক প্রকার বিষ। ইহা খাইলে বমি করাইবার চেস্টা করিতে হইবে। ম্যাচ বাক্সে যে ফস্‌ফরাস্‌-ঘটিত দ্রব্য থাকে, তাহা খাইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। এরূপ স্থলে বমি করাইয়া চা-খড়ি মিশ্রিত জল খাইতে দিবে।

মূর্চ্ছা।—রোগীর মূর্চ্ছা হইলে তাহাকে মাটিতে লম্বা করিয়া ডানদিকে কাৎ করিয়া শোয়াইবে। মাথার নীচে বালিশ বা কিছু কাপড় পুটুলি করিয়া দিবে, যেন মাথা শরীরের সমান উচু হয়। তৎপর, রোগীর দেহের জামা প্রভৃতি খুলিয়া বুক ও উদর অনাবৃত করিয়া দিবে। রোগী যাহাতে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত বায়ু পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। রোগীর চারিদিকে লোক জমিতে দিবে না, রোগীর নিকট তাহার বিপদের কথা আলোচনা করিবে না। মুখ ও বুকে ঠাণ্ডা জলের ছিটা দিয়া তৎক্ষণাৎ উহা মুছিয়া ফেলিবে। যদি রোগীর কিছু গিলিবার শক্তি থাকে তবে তাহার মুখে ফোঁটা ফোঁটা একটু একটু জল দিবে।

সর্দ্দি-গর্ম্মি।—সর্দ্দি-গর্ম্মি কঠিন ব্যাধি। যখন রৌদ্রে বেড়াইতে বেড়াইতে বা কাজ করিতে করিতে লোকে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, তখনই তাহাকে ছায়াপ্রদ স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। রোগীর গায়ের জামা প্রভৃতি খুলিয়া, তাহার মুখে এবং বক্ষঃস্থলে জল ছিটাইতে হইবে। জল ছিটাইবার সময় রোগীর বক্ষঃস্থল এবং বাহুর চর্ম্ম ঘষিতে হইবে। রোগীর নিকট ভিড় করিবে না। রোগী যাহাতে মুক্ত বাতাস পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি সুচিকিৎসক ডাকিয়া আনিতে হইবে। রোগীকে এক আউন্স বা ৪৮০ গ্রেণ সোডি-সালফাস্ (Sodi-Sulphus) তিন আউন্স জলে গুলিয়া খাওয়াইতে হইবে। তাহা পাওয়া না গেলে, ২ ফোটা ক্রোটন

তৈল (Croton oil) একটু চিনির সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতে হইবে।

সন্ন্যাস রোগ।—সন্ন্যাস রোগ হঠাৎ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধিতে আক্রমণ করিলে লোকে হঠাৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়; তাহার কথা বলিবার শক্তি থাকে না। রোগীর দেহের একদিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া যায়। মুখ একদিকে বাঁকিয়া যায়। এই ব্যাধি অতি ভয়ানক। মাথার ধমনী ছিঁড়িয়া যাইয়া ইহা হয়। এই ব্যাধি হইলে রোগীর জীবন রক্ষা করা কঠিন; তবুও চেষ্টার ক্রুটি করিতে নাই। কালবিলম্ব না করিয়া সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকাইবে। রোগীর কাপড় ঢিলা করিয়া দিবে, তাহাকে ডাকাডাকি করিবে না। মাথায় শীতল জল বা বরফ দিবে। রোগীর নিকট ভিড় করিবে না। রোগী যাহাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু পায় তাহার ব্যবস্থা করিবে।

বজ্রাঘাত।—বজ্রাঘাতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই লোকের প্রাণ বিনাশ হয়। সুতরাং চিকিৎসার সময় থাকে না; কিন্তু অনেক সময় ভয়ে বা অল্প পরিমাণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও লোকে সংজ্ঞা-শূন্য হয়, তখন তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করা উচিত। যত শীঘ্র হয় অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইবে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে। ব্রাণ্ডি, মকরধ্বজ প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে।

বজ্রাঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন করা যাইতে পারে, যথা ঃ—

(১) প্রায় সমুদয় সরকারী অট্টালিকাতে বজ্রাঘাত-নিবারক তার আছে, ইহা তোমরা দেখিয়াছ। সকলের গৃহে এইরূপ বজ্রাঘাত-নিবারক তারের ব্যবস্থা করা ভাল।

(২) ঝড়-বৃষ্টির সময়, উচ্চ বৃক্ষ বা অট্টালিকার মধ্যে থাকা বিপজ্জনক।

(৩) নিকটে কোন উচ্চ পদার্থ না থাকিলে স্রোতের নিকট দাঁড়াইবে না।

(৪) বজ্রপাতের সময় খুব ভিড়ের মধ্যে থাকিবে না।

(৫) ঝড়-বৃষ্টির সময় ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য বা মণিমুক্তা প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় চলিবে না। উহাতে তড়িৎ আকর্ষণ করে।

(৬) গাড়ীতে যাইবার সময় গাড়ীর পার্শ্বে ঠেস দিয়া বসিবে না। তড়িৎ গাড়ীর গা দিয়া চলিয়া যায়। ভিতরে বসিলে কোন আশঙ্কা থাকে না।

(৭) ঝড়ের সময় গাছতলা অপেক্ষা ফাঁকা মাঠে শুইয়া থাকা ভাল; গাছ প্রভৃতিতে তড়িৎ আকর্ষণ করিতে পারে।

গলায় কাঁটা-ফোটা।—আহারের সময় হঠাৎ মাছের কাঁটা গলায় বিঁধিলে ভাতের দলা পাকাইয়া গিলিয়া খাইবে। তাহা হইলে তাহার সহিত মাছের কাঁটা নামিয়া যাইবে। বেশী পরিমাণে জল খাইলেও ঐ কাজ হইতে পারে। যদি এই প্রকারে কাঁটা খুলিয়া না যায় তবে যবের ছাতু ও কলা খাইতে দিবে।

উদরে কোন-দ্রব্য প্রবেশ।—ছেলেরা অনেক সময় সিকি, দুয়ানি, পিন, বোতাম প্রভৃতি গিলিয়া ফেলে। এইরূপ

ঘটনা ঘটিলে রুটি, আলু, কলা প্রভৃতি খাদ্য খাইতে দিবে। উহাতে মল-কাঠিন্য উপস্থিত হইবে এবং মলের সহিত ঐ সকল দ্রব্য পেট হইতে নির্গত হইবে।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে আঙ্গুল দিয়া নাসিকা চাপিয়া ধরিলে রক্ত বন্ধ হইতে পারে। মাথায় এবং ঘাড়ে শীতল জল প্রয়োগ করিতে হয়। নাসারন্ধ্রে এক টুক্‌রা এবং মুখের মধ্যে এক টুক্‌রা বরফ দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। লবণ-মিশ্রিত জল নাসিকার মধ্যে টানিয়া লইলে কখনও কখনও রক্ত বন্ধ হয়। এই সব প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যদি রক্ত বন্ধ না হয় তবে ডাক্তার ডাকিবে।

নাসিকার মধ্যে কোন বাহিরের দ্রব্য প্রবিষ্ট হওয়া।—ছোট বালক-বালিকারা অনেক সময় নাকের মধ্যে মটর, তেঁতুলের বীচি, কুচ, শ্লেট-পেন্সিল ইত্যাদি ঢুকাইয়া দেয়। ঐরূপ ঘটিলে, বেশী খোঁচাখুচি করা উচিত নহে, উহাতে বিপদ্ আরও বেশী হইতে পারে। যে নাক পরিষ্কার আছে, সেই নাক টিপিয়া ধর এবং অন্য নাক খুব জোরে ঝাড়। নস্য লইয়া খুব হাঁচি দিতে পার। এইরূপ করিলে নাকের মধ্যে যাহা প্রবেশ করিয়াছে তাহা হাঁচির বেগের সহিত বাহির হইয়া যাইতে পারে। ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে মাষ্টার্ড ও জল এক সঙ্গে গুলিয়া খাওয়াইবে। ইহাতে বমির উদ্রেক হইবে। বমি করিবার সময় মুখ চাপিয়া ধরিলে

নাক দিয়া বমি বাহির হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিষটিও বাহির হইয়া যাইতে পারে। যদি এই প্রণালীতে উহা বাহির না হয় তবে মেয়েদের চুলের কাটা, যাহার মাঝখানে বাঁকান, ঐ বাঁকান দিক্‌টা প্রবেশ করাইয়া দ্রব্যটি টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিবে।

চক্ষুর পীড়া।—চক্ষুর মধ্যে কয়লার টুক্‌রা বা অন্য কোন ময়লা প্রবেশ করিলে, চক্ষু আঙ্গুল দ্বারা ডলিবে না বা রুমাল দ্বারা উহা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে না। রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াও। তৎপর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্য অঙ্গুলির দ্বারা, চোখের যে পাতার নীচে ঐ দ্রব্য আছে উহাকে টানিয়া অপর পাতার উপর কিছুক্ষণ টানিয়া রাখিয়া পরে ছাড়িয়া দিবে। ইহাতে কয়লার টুক্‌রা প্রভৃতি ময়লা অতি সহজেই বাহির হইয়া আসে। যদি এই প্রকারে কয়লার গুড়া বা পোকা বাহির না হয়, তবে একটি চাউল ঐ পাতার নীচে কিছুক্ষণ রাখিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া, পরে চক্ষু খুলিলে ঐ গুড়া চাউলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা যদি ময়লা নির্গত না হয়, তবে চোখের পাতা উল্টাইতে হইবে। ডান হাত পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যম অঙ্গুলি দ্বারা চোখের পাতা ধর। তাহার পর পাতার উপর একটি পেন্সিল দিয়া চাপিয়া ধর এবং পাতাটি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠাও। ইহাতে পাতাটি উল্টাইয়া যাইবে। তখন পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা দ্বারা ময়লাটি মুছিয়া বাহির করিবে। তৎপর

চক্ষুর মধ্যে কয়েক ফোঁটা বোরিক লোশন দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

চক্ষুর প্রদাহ উপস্থিত হইলে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হয়। চক্ষু লাল হয়, উহা হইতে জল পড়ে, পূঁয পড়িতে আরম্ভ করে ; এমন কি পূঁযের জন্য চক্ষুর পাতা বুজিয়া থাকে। চক্ষুর মধ্যে জ্বালা করে, খচ্ খচ্ করে, আলোর দিকে তাকান যায় না। চক্ষুর এইরূপ পীড়া হইলে ডাক্তারকে দেখাইয়া ঔষধ ব্যবহার করিবে। ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে অন্য কোন লোকের কথায় কোন ঔষধ চক্ষুর মধ্যে দিও না। উহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই পীড়া খুব ছোঁয়াচে ; বাড়ীতে এক জনের হইলে সকলেরই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তির এই পীড়া হয়, তাহার সহিত একত্র শয়ন করিবে না বা বসিবে না। তাহার গামছা, রুমাল, কাপড় প্রভৃতি জিনিষ ব্যবহার করিবে না।

চক্ষুর অনিষ্ট অতি সহজেই হইতে পারে। চক্ষুর কোন দোষ হইলেই উপযুক্ত ডাক্তারকে দেখাইবে এবং তাহার পরামর্শ মত চলিবে।

কর্ণের পীড়া ও তাহার চিকিৎসা—কাণে কোন পোকা প্রবেশ করিলে, একটু নারিকেল তৈল কাণের মধ্যে দিলে উহা মরিয়া যাইবে। তৎপর পিচকারীর সাহায্যে কাণ ধুইলে পোকাটির মৃতদেহ বাহির হইয়া যাইবে। কাণে বাহিরের কোন জিনিষ ঢুকিলে, যদি এমন জিনিষ না হয় যে, জল লাগিলে

উহা ফুলিয়া উঠে তবে কাণ নীচু করিয়া পিচকারীর দ্বারা ধুইবে। জলের পিচকারী দিবার পূর্ব্বে ২।১ ফোঁটা তৈল দেওয়া ভাল। সহজে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে চিকিৎসক ডাকিবে।

কর্ণের প্রদাহ বড় কষ্টদায়ক। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগিয়া প্রদাহ উপস্থিত হয়। তখন রোগীকে শয়ন করাইবে এবং কাণের পিঠে গরম সেক দিবে। কাণের মধ্যে গরম (যতটা সহ্য হয়) তৈল বা জল মাঝে মাঝে কয়েক ফোঁটা দিতে হইবে।

কাণ পাকিলে পরিষ্কার তূলার দ্বারা তূলি প্রস্তুত করিয়া কাণের ভিতর দিয়া পূঁয মুছিয়া ফেলিবে। তূলি প্রস্তুত করিতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে—যেন তূলির কাঠিটি বাহির হইয়া না থাকে; কারণ, তাহা হইলে কাণের পটহে খোঁচা লাগিয়া অনিষ্ট হইতে পারে। তৎপর গ্লিসারিণের মধ্যে বোরিক এসিড্ মিশাইয়া কয়েক ফোঁটা কাণের মধ্যে দিবে এবং তূলা দিয়া কাণের ছিদ্র বন্ধ করিবে। প্রত্যহ কাণ পরিষ্কার করিয়া এই ঔষধ দিলে কাণপাকা সারিবে।

যদি কাণের পীড়া সারিতে বিলম্ব হয় তবে চিকিৎসক দেখাইবে। চক্ষুর ন্যায় কর্ণেরও সহজে অনিষ্ট হয়। কাণের ব্যাধি অবহেলা করিলে বধির হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

জলমগ্ন রোগীর চিকিৎসা।—জলমগ্ন রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে সাধারণতঃ দুইটি মূল সূত্র মনে রাখিতে হইবে—

(১) প্রথমে, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস-সম্পাদন করিতে হইবে এবং (২) দ্বিতীয়তঃ রোগী, স্বাভাবিকভাবে শ্বাস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে যাহাতে তাহার দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার সাহায্য হয় এরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। অধিক সময় জলে ডুবিয়া থাকিলে শ্বাসরোধ হওয়ায় মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং ঠাণ্ডা জল লাগায় শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায় ও রক্ত চলাচল বন্ধ হয়। অধিকক্ষণ এরূপভাবে থাকিলে মৃত্যু হইতে পারে।

জল হইতে দেহ তুলিয়াই, তাড়াতাড়ি নাকের ও মুখের ভিতরে আঙ্গুল দিয়া সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেল। গায়ে জামা থাকিলে তাহা ছিঁড়িয়া ফেল। মুখ হাঁ করাও এবং দাঁতের মাঝে এক টুকরা কাঠ দিয়া রাখ। তাহা হইলে মুখ হাঁ করিয়া থাকিবে, বন্ধ হইবে না। তারপর রোগীকে উপুড় কর। তোমার দুই বাহু দ্বারা তাহার দেহের মধ্যস্থল বেষ্টন করিয়া তাহাকে উচু কর। এরূপ করিলে পেটের মধ্য হইতে ও ফুস্‌ফুসের মধ্য হইতে নাক ও মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া যাইবে। নাক ও মুখ দিয়া জল বাহির হওয়া বন্ধ হইলেই রোগীর দেহ নামাও এবং তাহার তলপেটের নীচে একটি বালিশ বা কতকগুলি কাপড়ের বাণ্ডিল রাখ। তাহার পর দুই হাত দিয়া রোগীর পিঠ একবার চাপা দাও, আবার পরক্ষণেই উহা ছাড়িয়া দাও। এক মিনিটে প্রায় ১২ বার এইরূপ কর। পিঠে চাপ দিলে ফুস্‌ফুস্ হইতে বায়ু নির্গত হয়। আবার চাপ ছাড়িয়া দিলে

বায়ু দ্বারা ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ হয়। ইহাই কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পাদন করা। অন্য প্রণালীতেও **কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পাদন**
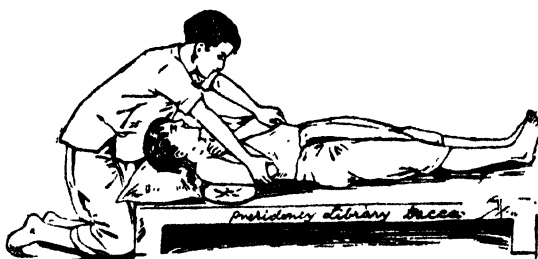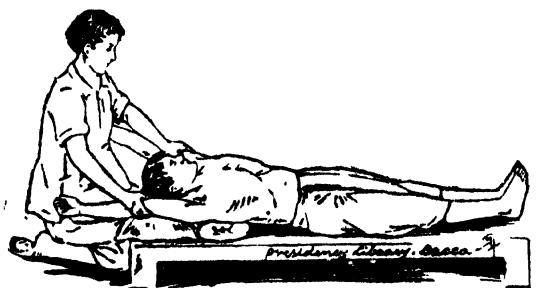
করা যাইতে পারে। রোগীকে চিৎ করাইয়া শোয়াইবে, তাহার মুখ ফাঁক করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপর রোগীর মাথার নিকট বসিয়া তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া আস্তে আস্তে উপরে তুলিয়া এবং টানিয়া মাথার সহিত সমান করিতে হইবে। ইহার দ্বারা বাহিরের নির্ম্মল বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিবে। সমুদয় কার্য্য এত ক্ষিপ্রগতিতে করা উচিত যেন দুই সেকেণ্ডের বেশী সময় না লাগে।

ইহার পর কালবিলম্ব না করিয়া রোগীর হাত দুইখানি মুড়িয়া আস্তে আস্তে নীচের দিকে টানিয়া বুকের দুই পাশে

আনিতে হইবে। ইহাতে ভিতরের বায়ু বাহিরে আসিবে। এই কার্য্যও দুই সেকেণ্ডের মধ্যে শেষ করিতে হইবে।

এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পাদন-চেষ্টা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত করিতে হইবে। অল্প সময় চেষ্টা করিয়া ফল না পাইলে হতাশ হইলে চলিবে না। অনেক সময় দুই ঘণ্টা এইরূপ পরিশ্রম করিবার পর তবে রোগীর জীবনের আশা হয়। ততক্ষণ পরিশ্রম করিতে ক্ষান্ত হইবে না।

শ্বাসগ্রহণে সাহায্য করিবার জন্য এইরূপ চেষ্টা যতক্ষণ চলিবে, তাহার মাঝে মাঝে একাধিকবার নস্য দেওয়া বা গলার মধ্যে পালক দিয়া শুড়-শুড়ি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। রোগীর বুকে ও মুখে পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও গরম জলের ঝাঁপটা দিয়া ঐ স্থানে বেশ করিয়া মর্দ্দন করা বিধেয়।

রোগী নিজে শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইলে, যাহাতে তাহার দেহের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় এবং রক্ত চলাচল করে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। রোগীকে শুষ্ক কম্বলে আবৃত করিয়া তাহার প্রত্যেক অঙ্গ নিম্ন দিক্ হইতে উপরের দিকে বিশেষ করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। গরম জল বোতলে পুরিয়া রোগীর পেটে, বগলে, পায়ের তলায় সেঁক দিতে হইবে। রোগী খাইতে সক্ষম হইলে গরম জলের সহিত ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। রোগীকে স্থির রাখিবে, এবং যাহাতে নিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার বন্দোবস্ত করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পচন-নিবারক ও পরিশোধক ঔষধাবলী

(ANTISEPTICS & DISINFECTANTS)

বীজাণু।—গ্রামে বাঘ আসিয়াছে—শুনিলে আমাদের বড় ভয় হয়; কখন আসিয়া ধরিয়া প্রাণ বিনাশ করে, সে চিন্তায় আমরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকি। মনে হয়, বাঘের মত শত্রু আর বুঝি মানুষের নাই। বাঘের আকার যত বৃহৎ হয়, আমাদের ভয়ও তত বেশী হয়। কিন্তু যে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু তাহার আকার এত ক্ষুদ্র যে, তাহাকে খালি চোখে দেখা যায় না। গ্রামে বাঘ আসিলে হয়ত কয়েকজন লোকের প্রাণ বিনাশ করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের এই শত্রুগুলির আক্রমণে যে প্রতিদিন কত লোকের মৃত্যু হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই শত্রুর নাম ব্যাধির বীজাণু (germs)। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে ইহার হাজারটি মিলিয়া সামান্য সরিষারও সমান হয় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এগুলি অতি ক্ষুদ্র জীব অর্থাৎ জীবাণু।

এই জীবাণুর বংশবৃদ্ধি অতি দ্রুত গতিতে হইয়া থাকে। গাছের বীজ মাটিতে পুঁতিলে তাহা হইতে বৃক্ষ, তাহার পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি হইতে কয়েকমাস সময় লাগে। কিন্তু

এই জীবাণুর বংশবৃদ্ধি এত তাড়াতাড়ি হয় যে, একটি জীবাণু হইতে মাত্র দশ ঘণ্টার মধ্যে দশ লক্ষ জীবাণু হইতে পারে। যে স্থান পঁচা ও দুর্গন্ধপূর্ণ জিনিষে ভরা, যেখানে সূর্য্যালোক ও বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে জীবাণু বংশবৃদ্ধি করিবার সুযোগ পায়।

ওলাউঠা, বসন্ত, টাইফয়েড, জ্বর, প্লেগ, যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধির সৃষ্টি বিভিন্ন জীবাণুকর্ত্তৃক হয়। এই সকল ব্যাধির জীবাণু আমাদের দেহের মধ্যেই প্রথম হইতে বাস করে না; সমস্তই বাহির হইতে আসে। রুগ্ন ব্যক্তি বা পশু হইতে এই জীবাণু সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ লাভ করে। কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কলেরা রোগের জীবাণু থাকে। যখন এই ব্যক্তি কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করে, তখন তাহার মুখ বা হাত হইতে ব্যাধির বীজাণু এই খাদ্যদ্রব্যে লাগিয়া যায়। অন্যে সেই খাদ্যদ্রব্য খাইলে এই বীজাণু ঐ সুস্থ ব্যক্তির উদরে প্রবেশ করে এবং সেখানে বৃদ্ধিলাভ করিবার সুবিধা হইলে ঐ ব্যক্তি কলেরায় আক্রান্ত হয়। কলেরারোগীর মলমূত্রেও রোগের বীজাণু থাকে। মলমূত্র জলে নিক্ষেপ করিলে এবং ঐ জল পান করিলে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপ, যক্ষ্মারোগীর থুথুতে ঐ ব্যাধির বীজাণু থাকে। দেওয়ালে বা মেজেতে ঐ থুথু ফেলিলে উহা শুকাইবে এবং উহা ধূলির সহিত মিশিয়া যাইবে। বায়ুর সহিত এই বীজাণু মিশ্রিত ধূলিকণা দেহে প্রবেশ করিলে যক্ষ্মা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার, ইন্দুর, মশা, মাছি,

কুকুর প্রভৃতি কতকগুলি জন্তু দংশন করিয়া আমাদের দেহে ব্যাধির বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দেয়।

আমাদের দেহে ব্যাধির বীজাণু প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার আছে—মুখ, নাসিকা এবং চর্ম্ম। খাদ্যের সহিত মুখের পথে, প্রশ্বাসের সহিত নাসিকা-পথে বীজাণু প্রবেশ করে। দেহের কোন স্থানে মশা, উকুন, ইন্দুর, ছারপোকা, কুকুর ইত্যাদি দংশন করিলে বা কাটিয়া গেলে, চর্ম্মের ভিতর দিয়া বীজাণু প্রবেশ করে।

বীজাণু ধ্বংসের ব্যবস্থা—সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে এই বীজাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, আমাদিগকে এরূপ সাবধানে চলিতে হইবে যেন বীজাণুগুলি দেহে প্রবেশ লাভ করিতে না পারে। কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিলে সংক্রামক রোগের বীজাণু দেহে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না তাহা তোমরা পূর্ব্বে পড়িয়াছ। ইহা ছাড়া, ভগবান্ ব্যাধির বীজাণুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শরীরে যে স্বাভাবিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল বায়ু, পরিমিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও সুনিদ্রা, সংযম—এই সবই শারীরিক শক্তিরক্ষার প্রধান উপায়।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাধির বীজাণুগুলি ধ্বংস করিতে হইবে এবং যাহাতে উহার বংশ-বৃদ্ধি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে উপায়ে সংক্রামক রোগের বীজাণু বিনষ্ট হয় তাহাকে

পরিশোধন-প্রণালী (desinfection) বলে এবং যদ্দারা বীজাণু ধ্বংস হয় তাহাকে বীজাণু-বিনাশক ঔষধ (disinfectants) বলে।

পরিশোধনপ্রণালী—পরিশোধক বা বীজাণুবিনাশক উপায় সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(১) সূর্য্য-কিরণ,

(২) উত্তাপ,

(৩) রাসায়নিক পদার্থ।

(১) **সূর্য্য-কিরণ** অনেক ব্যাধির বীজাণু ধ্বংস করে। উহা প্রকৃতিপ্রদত্ত উপায়। দেহের যে স্থানে সূর্য্যালোক পতিত হইবার সুবিধা পায় সেস্থানে চর্ম্মরোগ খুব কমই হইয়া থাকে। হাসপাতালের যে কক্ষে সূর্য্যালোক অধিক পরিমাণে প্রবেশ করে সেই কক্ষের রোগী অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করে। এই নিমিত্ত বাড়ীতে এবং গৃহাভ্যন্তরে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস খেলিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিবে। পূর্ব্বদিক্ খোলা রাখিলে সূর্য্যালোক বাড়ীতে প্রবেশ করিবার কোন বিঘ্ন হয় না। যেখানে রৌদ্র লাগে না, সেখানে ব্যাধির বীজাণু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিছানা প্রতিদিন রৌদ্রে দিতে হইবে। রুগ্ন ব্যক্তির শয্যা রৌদ্রে দিতে যেন ভুল না হয়। গৃহের অন্যান্য কাপড়-চোপড়, পুস্তক এবং আসবাব-পত্র রৌদ্রে দেওয়া ভাল। রৌদ্রের জীবাণুনাশের স্বাভাবিক শক্তি থাকিলেও

আমাদের কেবল রৌদ্রের উপর নির্ভর করা উচিত নহে, অন্যান্য প্রক্রিয়াও অবলম্বন করা উচিত।

(২) **উত্তাপ**।—উত্তাপে সকল বীজাণু নষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রকারে আমরা এই উত্তাপ প্রয়োগ করিতে পারি। যথা,—

(ক) দগ্ধ করা।—জীবাণু-পূর্ণ জিনিষপত্র পোড়াইয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। উহার মূল্য যদি বেশী না হয়, তবে উহা পোড়াইয়া ফেলিবে। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীর জামা, কাপড়, বিছানা-পত্রাদি পোড়াইয়া ফেলাই ভাল। যে গৃহে যক্ষ্মা বা বসন্তরোগাক্রান্ত রোগী বাস করিয়াছে, তাহা কাঁচা হইলে পোড়াইয়া ফেলাই ভাল—ইহাই অনেক চিকিৎসকের মত। যক্ষ্মারোগীর থুথু, বসন্তরোগীর পূঁয, কলেরা রোগীর মলমূত্র ইত্যাদি কেরোসিন তৈল ও কাঠের গুড়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

(খ) সিদ্ধ করা।—ফুটন্ত জলে কতকক্ষণ সিদ্ধ করিলে বীজাণু মরিয়া যায়। রোগীর ব্যবহৃত জামা কাপড় প্রভৃতি সাবান দিয়া ধুইয়া ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিবে—তাহা হইলে ঐ সকল কাপড়ে যে বীজাণু থাকিবে তাহা মরিয়া যাইবে। রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্রাদি ফুটন্ত জলে ধুইয়া লইবে। কলেরা রোগের বীজাণু দুগ্ধ ও জলের দ্বারা অনেক সময় সংক্রামিত হয়। **জল ও দুধ খুব ফুটাইয়া পান করিবে**। চিকিৎসকেরা অস্ত্র করিবার যন্ত্রাদি এবং ব্যাণ্ডেজ করিবার কাপড় গরম জলে সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ বাষ্পের দ্বারা শোধন করিয়া ব্যবহার

করেন। দেহের কোন স্থানে কাঁটা ফুটিলে, যদি সূঁচের দ্বারা উহা বাহির করিতে হয়, তবে সূঁচটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

(গ) বাষ্প প্রয়োগ করা।—কিন্তু সকল প্রকার কাপড় ও দ্রব্যাদি জলে সিদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। সেই জন্য বাষ্পদ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে। এই প্রকারে পরিশোধন করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার যন্ত্রাদি পাওয়া যায়।

রাসায়নিক পদার্থ।—ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা,—(ক) পরিশোধক (disinfectants)—ইহরা জীবাণু নষ্ট করে; (খ) পচন-নিবারক (anti-septics)—ইহারা জীবাণু বৃদ্ধি হইতে দেয় না এবং (গ) দুর্গন্ধ নাশক (deodorants)—ইহারা দুর্গন্ধ চাপা দেয় মাত্র. জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে না। ইহাদের দৃষ্টান্ত ঃ—

পরিশোধক—কার্ব্বলিক এসিড, পার্ম্মেঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্।

পচন-নিবারক—বোরাক্স, বোরিক এসিড, কার্ব্বলিক এসিড।

দুর্গন্ধনাশক—ফিনাইল, কর্পূর, ইউক্যালিপ্টাস তৈল, গন্ধ দ্রব্য।

অনেক রাসায়নিক দ্রব্য আছে যাহাদের দ্বারা পরিশোধন-ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। তন্মধ্যে সাধারণ কতকগুলির কথা বলিতেছি ঃ—

(ক) **পার্ম্মেঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্** (Permanganet of Potash)।—অল্প পরিমাণে জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জল

দ্বারা রোগীর ঘরের আসবাবপত্র ধৌত করিয়া উহা শোধন করা হয়। কূপ বা পুকুরের জল দূষিত হইলে, ইহা জলে গুলিয়া দিলে জল শোধিত হয়। জলে ঐ ঔষধদ্রব্য গুলিয়া দিলে যদি অর্দ্ধঘণ্টা পরে ঐ জল নানা বর্ণ ধারণ করিতে থাকে তবেই বুঝিবে যে, উহা জল-শোধনের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে।

(খ) **কার্ব্বলিক এসিড** (Carbolic Acid)।—এক শত ভাগ জলের সহিত ৫ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড মিশাইয়া জামা, কাপড় ইত্যাদি শোধিত করা যায়। পিকদানি প্রভৃতিতে ঐ জল কতকটা রাখিয়া দিয়া তাহাতে রোগীর কাশি প্রভৃতি ফেলা ভাল।

(গ) **ব্লিচিং পাউডার** (Chloride of Lime)।—ব্লিচিং পাউডার নামক এক প্রকার সাদা গুড়ার মত ঔষধ পাওয়া যায়। জলে ব্লিচিং পাউডার দিলে উহার দোষ কাটিয়া যায়। ব্লিচিং পাউডারে জল মিশ্রিত করিলে এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয়। ঐ গ্যাস জীবাণু-নাশক। এই পাউডারে শতকরা $\frac{১}{২}$ ভাগ ক্লোরিন গ্যাস থাকিলেও তাহা কার্য্যকরী হয়। ঘরের মেজে, দেয়াল এবং আসবাবপত্র ও মলমূত্র শোধন করার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) **ফর্ম্মালিন** (Formalin) উত্তম পরিশোধক। শত করা ৪০ ভাগ ফরম্যাল-ডি-হাইড গ্যাস যদি জলের মধ্যে মিশ্রিত থাকে তাহাকেই ফর্ম্মালিন বলা হয়। যে সকল কাপড় বা অন্য জিনিষ গরম জলে সিদ্ধ করা সম্ভবপর হয় না,

তাহা ফর্ম্মালিনের সাহায্যে পরিশোধিত করা হয়। একটি বাক্সের মধ্যে একখানা কাপড় রাখ। তাহার উপর এই ঔষধ একটু দাও, তাহার উপর একখানা কাপড় দিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধ ছিটাও। এই প্রণালীতে কাপড়গুলি বাক্সে ভরিয়া ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করিয়া দাও। ইহা বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগ-বীজাণু ধ্বংস করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) **বাই-ক্লোরাইড অব্ মারকারী** (Bi-chloride of Mercury)।—উত্তম পরিশোধক; কিন্তু খুব বিষাক্ত এবং বর্ণবিহীন। এজন্য খুব সাবধানতা অবলম্বনে উহা ব্যবহার করিতে হয়। ১০০০ ভাগে ১ ভাগ এই মাত্রায় দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ইহা ব্যবহারের জন্য বড়ির আকারে প্রস্তুত থাকে। দুই গেলাস জলের মধ্যে দুইটি বড়ি গুলিয়া তাহা দিয়া হাত ধুইলে কোন জীবাণু লাগিয়া থাকিলে নষ্ট হয়। রোগীর ব্যবহৃত রুমাল বা গামছা এই জলে ভিজাইয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল রাখিবে, পরে উহা ধুইয়া লইবে।

(চ) **আইজাল** (Izal)।—আইজাল দ্বারা সহজেই টাইফয়েড রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে পারা যায়। এক ভাগ আইজালের সহিত ৫০০ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে সুন্দররূপে পরিশোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

(ছ) **লাইজল** (Lysol)।—১০০ ভাগ জলের মধ্যে ইহার ১ ভাগ মিশাইতে হয়। উত্তম পরিশোধক, কিন্তু দুর্ম্মূল্য।

(জ) **ফিনাইল** (Phenyle)।—ইহার কার্য্য কার্ব্বলিক এসিডের ন্যায়। দাম ইহার বেশী নহে।

(ঝ) **চূণ**।—টাট্‌কা বা পোড়ান চূণে অনেক প্রকার জীবাণু নষ্ট হয়। ঘরের দেওয়াল ভালরূপে ঘষিয়া ফেলিয়া দুইবার চূণের পোঁচ দিলে অনেক প্রকার বীজাণু নষ্ট হয়।

(ঞ) **সাবান**।—পরিশোধক দ্রব্যের মধ্যে ইহা একটি প্রধান জিনিষ।

(ট) **কাঠের কয়লা ও চূণ**।—ইহারা পরিশোধক ও দুর্গন্ধনাশক।

(ঠ) **কেরোসিন তৈল**।—ইহা অনেক প্রকার বীজাণু নষ্ট করে।

(ড) সালফার ডাই-অক্‌সাইড্ বা গন্ধকের ধূম প্রয়োগে অনেক বীজাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঘর শোধন করার জন্য এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়। একটি পাত্রে জল রাখিয়া তাহার ভিতর আর একটি ছোট পাত্রে গন্ধক রাখিয়া অগ্নির উত্তাপ দিতে হয়; তাহা হইলে ঐ গ্যাস জমিয়া বাষ্পের সহযোগে কার্য্যকরী হয়।

কোন সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু লাগিলে কোন্ জিনিষ কিরূপে পরিশোধন করিতে হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

(১) **বিছানা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি**—সম্ভবপর হইলে আগুনে পোড়াইয়া ফেলিবে। নতুবা উহাদিগকে কার্ব্বলিক এসিড লোশনে ২৪ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া তৎপর গরম জল ও সাবান দিয়া পুনরায় ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে।

(২) **পুস্তক** এবং **চর্ম্মের জিনিষ**।—সম্ভবপর হইলে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে, নতুবা একটি বাক্সের ভিতর রাখিয়া উহার ভিতর গন্ধকের ধূম বা ফরম্যাল্-ডি-হাইড গ্যাস (formal-de-hyde gas)-এর ধূম দিতে হইবে।

রেশম ও পশমের কাপড়-চোপড়।—রেশম ও পশমের কাপড় অন্য প্রণালীতে পরিশোধিত করিতে গেলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ রৌদ্রে দিতে হইবে।

মল, মূত্র, পূঁয, থুথু, বমি ইত্যাদি।—রোগী মল ইত্যাদি ত্যাগ করামাত্র তাহার সহিত কার্ব্বলিক এসিড, আইজাল, লাইজল, বাই-ক্লোরাইড অব্ মারকারী—ইহাদের যে কোন একটি মিশাইবে। তৎপর তাহার সহিত কাঠের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া আগুন দিয়া পোড়াইবে। অবশেষে ৫ ভাগ চূণ ও এক ভাগ কার্ব্বলিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া উহা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে। শুষ্ক মাটি, কয়লার ছাই, চূণ ও ব্লিচিং পাউডার দিলে দুর্গন্ধ নাশ হয়।

মৃতদেহ।—সংক্রামক রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে কড়া কার্ব্বলিক এসিড লোশনে অথবা ফরম্যালিন্ দ্রাবণে সিক্ত এক খানা কাপড় দিয়া মৃতদেহ ঢাকিয়া রাখিবে। তৎপর তাহাকে পোড়াইয়া ফেলিবে বা পুঁতিয়া ফেলিবে। পুঁতিবার সময় গর্ত্ত গভীর করিতে হইবে।

আসবাব-পত্র।—চেয়ার, টেবিল, তক্তপোষ প্রভৃতি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্রব্য খুব গরম জল ও সাবান দিয়া ঘষিবে। তৎপর

জলে ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত করিয়া তাহা দিয়া ধুইবে এবং উহাতে নূতন বার্ণিস লাগাইবে।

হাত।—সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর দেহ, বিছানাপত্র স্পর্শ করিলে হাতে বীজাণু লাগিতে পারে। এই নিমিত্ত গরম জল ও সাবান দিয়া হাত বেশ করিয়া ধৌত করিবে। তৎপর পাঁচ মিনিট কাল এল্‌কোহল (alchohol)-এর মধ্যে হাত ডুবাইয়া রাখিবে।

রোগীর গৃহ।—রোগীকে যে ঘরে রাখিবে সে ঘর হইতে অনাবশ্যক বিছানা, কাপড়-চোপড়, আসবাব-পত্রাদি স্থানান্তরিত করিবে। যে ঘর সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, অথচ যাহাতে আলোক ও বাতাসেরও অভাব নাই, এইরূপ ঘরে রোগীকে রাখিবে। কুড়িভাগের একভাগ কার্ব্বলিক লোশনে ভিজাইয়া একখানা পর্দ্দা রোগীর ঘরের দরজায় টাঙ্গাইয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে রোগের বীজাণু দরজা দিয়া বাতাসের সহিত বাহির হইতে গেলে নষ্ট হইবে এবং হঠাৎ কেহ ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। রোগীর ঘরের জানালা প্রভৃতি খুলিয়া রাখিবে। রোগীর গৃহে তাহার পরিচর্য্যাকারিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও যাইতে দিবে না। পরিচর্য্যাকারিগণ পরিশোধক ঔষধে হস্ত ধৌত করিয়া রোগীর সেবা করিবে এবং সেবা করিয়া পুনরায় পরিশোধক ঔষধে হাত ধুইবে। পরিচর্য্যাকারিগণ অনাবশ্যক পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে না; যাহা সহজে ধৌত করা যায় এইরূপ কাপড়, পোষাক পরিধান করিবে। পরিশোধিত না করিয়া

রোগীর গৃহ হইতে কোনপ্রকার দ্রব্য স্থানান্তরিত করিবে না। রোগীর মলমূত্রাদি পূর্ব্বলিখিত প্রণালীতে পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলিবে। আরোগ্য লাভ করিলে, সাবান ও জল দ্বারা রোগীকে বেশ করিয়া ধৌত করিবে এবং নূতন কাপড় পরাইয়া অন্য ঘরে লইয়া যাইবে। রোগী স্থানান্তরিত হইলে, গৃহখানা সামান্য মূল্যের হইলে পোড়াইয়া ফেলা সঙ্গত; পাকা ঘর হইলে দেওয়াল ও ভিতরের ছাদে এবং মেজেয় পরিশোধক লোশন দিতে হইবে। গৃহের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া গন্ধক পোড়াইয়া তাহার ধূম দিয়া পরে দরজা-জানালা খুলিয়া দিতে হয়। ঘরে চূণকাম করিতে হয়।

পায়খানা ও নর্দ্দমা।—পায়খানা ও নর্দ্দমা কার্ব্বলিক এসিড লোশন দিয়া পরিশোধিত করিতে হয়। ফিনাইল দিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

ধাতুদ্রব্য।—রোগীর ব্যবহৃত বাসন-পত্রাদি ১০০ ভাগ জলের সহিত ৫ ভাগ কার্ব্বলিক এসিড মিশাইয়া ধৌত করিতে হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড—অষ্টম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

জলপ্রাপ্তির স্থান

জলের প্রয়োজনীয়তা।—১। নানা কারণে আমাদের সর্ব্বদাই প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। জল আমাদের খাদ্যের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। ইহা রক্তের তরলতা রক্ষা করে; অপ্রয়োজনীয় দূষিত দ্রব্যাদি শরীর হইতে নির্গমনের সহায়তা করে, শরীরাভ্যন্তরীণ যন্ত্রসকলের কার্য্যে সহায়তা করিয়া তন্তুগঠনকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। খাদ্যদ্রব্যকে দ্রব করিয়া উহার পরিপাক কার্য্য ও শোধন কার্য্যের জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। জল রক্তকে তরল রাখিয়া উহা সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত করিবার সহায়তা করে। মোট কথা, একজন মানুষের দেহে শতকরা ৭০ ভাগই জল, জানিবে। ঐ মানুষের ওজন যদি ১৫৪ পাউণ্ড হয়, তবে তাহার শরীরে প্রায় ১১ গেলন জল থাকিবে।

২। শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য জলের আবশ্যক।

৩। পাক করিবার জন্য, বাসনপত্র মাজিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য এবং ঘর প্রভৃতি ধৌত করিবার জন্য জলের প্রয়োজন হয়।

৪। পোষাক-পরিচ্ছদ ও কাপড় ধুইবার জন্যও জলের আবশ্যক।

৫। প্রাণিমাত্রেরই পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য এবং অবগাহনাদির দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য জলের প্রয়োজন।

৬। রাস্তায় জল দেওয়া, অগ্নি নির্ব্বাপিত করা, এবং জলপ্রবাহের দ্বারা নর্দ্দমা পরিষ্কার করা, জিনিষ পত্র পরিষ্কার করা প্রভৃতি নানা কার্য্যের জন্য ইহা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৭। জল বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে এবং ভূ-গর্ভস্থ মাটিকে শোধন করে।

৮। রোগ-চিকিৎসায়ও চিকিৎসকগণ জলের নানাপ্রকার সাময়িক প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

জল-প্রাপ্তির স্থান।—প্রাকৃতিক নিয়মে আমরা নদী, খাল, ফোয়ারা, পুকুর, ইন্দারা ও কূপে জল পাইয়া থাকি। এই জলই সাধারণতঃ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, ঐ জল প্রাকৃতিক উপায়ে সমুদ্র হইতে সূর্য্যরশ্মি দ্বারা বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বাতাসের সহিত উড়িয়া কোন শীতল পর্ব্বতের সংস্পর্শে আসিয়া মেঘরূপে অথবা জমিয়া বরফ আকারে তথায় অবস্থান করে। গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ ঐ মেঘ বৃষ্টিরূপে পতিত হয় এবং বরফ গলিয়া জল চোয়াইয়া পাহাড়ের উচ্চ শিখর হইতে ক্রমে নিম্নগামী হয়। এই প্রকারে নদী, নালা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভূপতিত বৃষ্টির জল মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে; এই জল ক্রমে এমন

একটি কর্দ্দমময় স্তরে যাইয়া উপস্থিত হয় যে, তথা হইতে আর নিম্নদিকে যাইতে পারে না এবং ঐ স্তরের উপর দিয়া চলিতে চলিতে কোথাও খাল বা নদী পাইলে তাহার জলের সহিত মিশিয়া যায়। মাটির স্তরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় ঐ জল, অনেক প্রকার লবণ এবং দূষিত গ্যাস ও রোগ-বীজাণু প্রভৃতি জৈব পদার্থ লইয়া যাইতে পারে। অতএব এই ভাবে জল দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু যদি ঐ কর্দ্দমময় স্তর ভেদ করিয়া জল আরও ভূগর্ভের দিকে নিম্নগামী হইতে পারে, তবে অধিকাংশ জৈব পদার্থ, যাহা জল দূষিত করিয়া থাকে, তাহা ঐ স্তরে আটকাইয়া যায়। এই কারণেই অতি গভীর কূপের জল প্রায়ই বিশুদ্ধ প্রমাণিত হইয়া থাকে এবং স্বল্প-গভীর কূপের জল প্রায়ই দুর্গন্ধ ও বিস্বাদযুক্ত হয়।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত স্থান হইতে আমরা জল পাইয়া থাকি :—

(১)	সমুদ্র	(৫)	ফোয়ারা
(২)	বৃষ্টি	(৬)	পুকুর
(৩)	নদী	(৭)	কূপ
(৪)	হ্রদ	(৮)	নলকূপ।

(১) **সমুদ্র**।—সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উঠিয়া বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে। বৃষ্টি হইয়া বা বরফ গলিয়া উহা কিরূপে নদী, খাল-বিলের সৃষ্টি করিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলিয়া পান করা যায় না। এজন্য সমুদ্রগামী

জাহাজ স্থলভূমি হইতে পানীয় জল লইয়া যায়। এই জল নিঃশেষ হইলে, যদি প্রয়োজন হয় তবে সমুদ্রের জল পরিশুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করে।

(২) **বৃষ্টির জল**।—অনেক স্থানের লোকের বৃষ্টির উপরই নির্ভর করিতে হয়, কিন্তু বৃষ্টি পড়িবার সময়ে বায়ুমণ্ডলের দূষিত পদার্থ ও ধূলাবালির সংস্পর্শে আসিয়া এই বৃষ্টির জল দূষিত হইয়া থাকে।

(৩) **নদী**।—নদী হইতে অমারা বহু জল পাইয়া থাকি, এমন কি, অনেক স্থানে নদীই লোকের জলপ্রাপ্তির একমাত্র স্থান। পর্ব্বতগাত্র হইতে যে সমস্ত জলস্রোত অকর্ষিত ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং যেখানে মানুষের নিবাস নাই, তথাকার জল সাধারণতঃ ভাল হইতে পারে। কিন্তু যে সমস্ত নদী মানুষের আবাসভূমির অতি নিকটে অবস্থিত তাহাদের জল প্রায়ই দূষিত হইয়া থাকে।

(৪) **হ্রদ**।—হ্রদ বলিলে যাহা বুঝায়, বঙ্গদেশে তাহা নাই। এদেশে কতকগুলি বিল আছে—উহাদের জল আবদ্ধ। ঐ বিলে শেওলা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে এবং উহা পচিয়া জল দূষিত হয়।

(৫) **ফোয়ারা**।—ফোয়ারার জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।

(৭) **পুকুর**।—আমাদের দেশে পুকুর হইতেও আমরা বহু জল পাইয়া থাকি। পল্লীগ্রামে অনেক বাড়ীতেই পুকুর আছে—পুকুরের জলে স্নান, রন্ধন প্রভৃতি সকল কার্য্যই চলিয়া থাকে। পূর্ব্বকালের হিন্দু রাজা এবং জমিদারগণ পুকুর খনন করিয়া

লোকের জলকষ্ট নিবারণ করা মহাপুণ্যের কাজ মনে করিতেন। অনেক গ্রামে এই প্রাতঃস্মরণীয় লোকদিগের কীর্ত্তি-চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংস্কার অভাবে অধিকাংশ পুকুর অস্বাস্থ্যকর পচা ডোবায় পরিণত হওয়ায় স্থানীয় স্বাস্থ্যের হানিকর হইয়াছে।

পুকুরের জল সাধারণতঃ পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না, কারণ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বাসগৃহের দূষিত জল মাটির ভিতর দিয়া চোয়াইয়া আসে। পুকুরের জল কিরূপে দূষিত হয় এবং উহা যাহাতে দূষিত হইতে না পারে তাহার জন্য কি করা উচিত, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

(৭) **কূপ**।—কূপ সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়, যথা,—(ক) স্বল্প-গভীর ও (খ) অতি-গভীর।

(ক) **স্বল্প-গভীর কূপ**।—ইহা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে সাধারণতঃ ৪০।৫০ ফুট নিম্নে কর্দ্দমময় স্তরের উপর পর্য্যন্ত খনন করা হইয়া থাকে। ইহার জল ভূপৃষ্ঠ হইতে নিম্নপ্রদেশে যাইবার সময় নানাপ্রকারে দূষিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব এ জল পানীয়-রূপে ব্যবহার করা সঙ্গত নয়।

(খ) **গভীর কূপ**।—বঙ্গদেশে ভূপৃষ্ঠের নিম্নে যে কর্দ্দমময় স্তর আছে, তাহা আক্রমণ করিয়া ১০০ হইতে ৩০০ ফুট খনন করা হয়, এবং কূপের গাত্র এমন সুদৃঢ় ছিদ্রহীন ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, উপরের স্তরের জল উহাতে চুয়াইয়া পড়িতে পারে না। ঐ স্তর ভেদ করিয়া জল ক্রমে নিম্নভাগে যাইতে

থাকে এবং কূপের তলদেশে যাইয়া উপস্থিত হয় ; এ জন্য জলের অধিকাংশ দূষিত পদার্থ ঐ কর্দ্দমাক্ত স্তরে আটকাইয়া যায়। এই জল সাধারণতঃ নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু, মাটির ভিতর দিয়া ঐ জল আসিবার সময় কিছু পরিমাণে খনিজ পদার্থ দ্রব করিয়া লইয়া আসে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারা জান্তব পদার্থ সকল আটকাইয়া যায়।

স্বল্প-গভীর বা অতি-গভীর কূপের ভিতর যে সর্ব্বদাই ভাল জল থাকিবে একথা বলা যায় না। এজন্য ঐ জল রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য স্বাস্থ্য-বিভাগের পরীক্ষাগারে পাঠান প্রয়োজন হয়।

(৮) **নলকূপের জল**।—পূর্ব্বোক্তরূপে কূপ খনন না করিয়া যদি নল বসাইয়া ভূগর্ভ হইতে পাম্পের সাহায্যে জল উঠাইবার ব্যবস্থা করা হয় তবে উহাকে নলকূপ বলে। স্বল্প-গভীর এবং অতি-গভীর নলকূপ বসাইবার খরচ কূপ নির্ম্মাণ অপেক্ষা অনেক কম। কূপের জল সহসা দূষিত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু নলকূপের জল পাম্পের দ্বারা ঢাকা থাকায় উহা বাহিরের দূষিত পদার্থের সংস্রবে সহসা আসিতে পারে না। বর্ত্তমানে পল্লীবাসীদের পানীয় জল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এইরূপ নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা ভাল। তবে, সকল স্থানে এইরূপ নল বসাইয়া ভাল ফল পাওয়া যায় না। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় এই প্রকারের নল-কূপ বসাইলে সুলভে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় এবং ওলাউঠা, সান্নিপাতিক জ্বর, আমাশয় ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিরূপে জল দূষিত হয়—দূষিত জল-জনিত ব্যাধি

জল কিরূপে দূষিত হয়।—সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় না। যদি জলের ভিতর রোগ-বীজাণু বা বদহজমকারক কোন দ্রব্য না থাকে, তবে ঐ জল নির্দ্দোষ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

জল সাধারণতঃ চারিপ্রকার পদার্থ দ্বারা দূষিত হয়—

১। ধূলা, বালি ও অন্যান্য আবর্জ্জনা দ্বারা,

২। নানাপ্রকার গ্যাস্ ও ধাতব পদার্থ দ্বারা,

৩। উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তুর গলিত দেহাদি দ্বারা, এবং

৪। নানাপ্রকার রোগের বীজাণু দ্বারা।

জলের মধ্যে এই দূষিত পাদার্থগুলি কখনও ভাসমান অবস্থায়, কখনও গলিত অবস্থায় থাকে। জল ঘোলা হইলে বুঝিতে হইবে উহাতে ধূলি মিশ্রিত আছে। ঐ জল কিছুক্ষণের জন্য একটি পাত্রে রাখিলে উহাতে তলানি পড়ে। কিন্তু অনেক সময় পরিষ্কার জলও দূষিত হইতে পারে। দৃশ্য ও অদৃশ্য নানাবিধ জীবাণু এবং উহাদের ডিম্ব, বিবিধ রোগের বীজাণু, নর্দ্দমার আবর্জ্জনা, জীবজন্তুর মলমূত্রাদি কত রকম অনিষ্টকর পদার্থ-ই যে জলে মিশ্রিত বা গলিত অবস্থায় থাকে তাহার সীমা নাই। সকল সময় উহা দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে

দেখিলে উহা দেখিতে পাওয়া যায়। ছবিতে দেখ, এক ফোঁটা অবিশুদ্ধ জল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করাতে কত রকম দূষিত পদার্থ দেখা যাইতেছে।
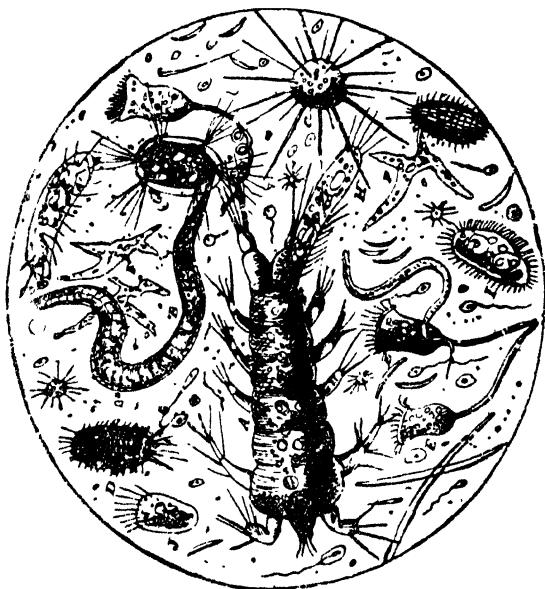
জলে ধূলাবালি থাকিলে আমরা খালি চোখে উহা দেখিতে পারি। জল প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ কিনা তাহা রাসায়নিক ও জীবাণু-তত্ত্ববিদের বিশেষ পরীক্ষা ব্যতীত বলা যায় না। তবে, যে জলে ময়লা ভাসিতে থাকে, যাহার কোনরূপ দুর্গন্ধ বা কোন বর্ণ আছে, সে জল কখনও পান করিবেনা; এরূপ জল যে দূষিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জল সম্বন্ধে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।—জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিগণ ভারতবাসীকে এ সম্বন্ধে তাহাদের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋষি-প্রণীত আয়ুর্ব্বেদে নিম্নপ্রকার অনুশাসন বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"জলে থু থু ফেলিবে না, মলমূত্রত্যাগ করিবে না; চুল নখ, খড় বা ছাই ফেলিবে না এবং ময়লা কাপড় ধৌত করিবে না। এইরূপ করিলে ভগবানের অতি মূল্যবান্ দানকে উপেক্ষা করা হইবে।"

বর্ত্তমান সময়েও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক জল দূষিত করিলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তাহাকে তিন মাসের জন্য কারাদণ্ড বা ৫০০৲ টাকা জরিমানা বা উভয়বিধ দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য-বিভাগ এই আইনের দ্বারা ঐরূপ দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। তোমরা সর্ব্বদা এই আইন মানিয়া চলিবে। কখনও কোন প্রকারে জল দূষিত করিবে না।

কিরূপে বৃষ্টির জল দূষিত হয়।—জল বৃষ্টিরূপে পতিত হইবার সময় বায়ুমধ্যস্থিত রোগ-বীজাণু প্রভৃতি দূষিত পদার্থ লইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। আবার, তথা হইতে মলমূত্রাদি দূষিত পদার্থ লইয়া উহার নিকটবর্ত্তী পুকুর, নদী বা নালায় যাইয়া উপস্থিত হয়। যে জল ভূ-গর্ভে প্রবিষ্ট হয় তাহা তথাকার খনিজ ধাতব পদার্থের সহিত এবং নিকটবর্ত্তী কূয়া-পায়খানার
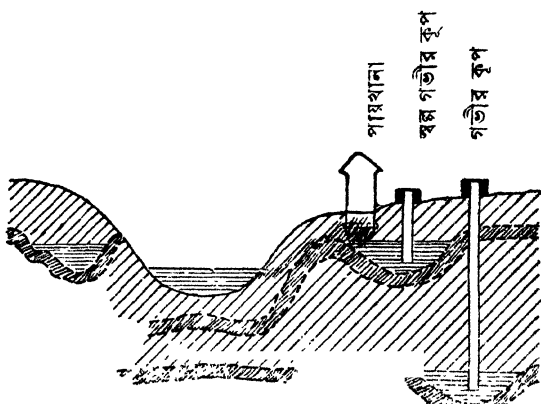
স্তরভেদে কূপের অবস্থা
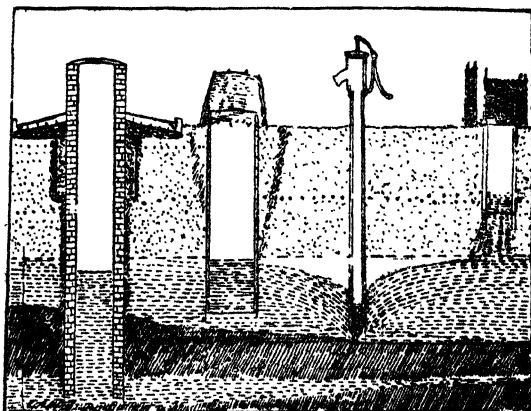
গভীর পাকাকুয়া বা ইন্দারার জল দূষিত হইতে পারিতেছে না; নিকটবর্ত্তী কূয়া-পায়খানার ময়লা জল স্বল্প-গভীর নলকূপ ও সাধারণ কূপের জল দূষিত করিতেছে।

দূষিত চুয়ানো জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমে দূষিত হইয়া থাকে।

কূপের জল।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গভীর নলকূপের জল সহজে দূষিত হয় না স্নুতরাং গভীর নলকূপই গ্রামে গ্রামে এবং বাড়ীতে বাড়ীতে বসান উচিত। অনেক গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেষ্টায় সর্ব্বসাধারণের জন্য নলকূপ বসান হইয়াছে। এই নলকূপের জলই সকলের পান করা উচিত। কিন্তু অনেক গৃহে কাঁচা কূপের জলই সম্বল। এই জল স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ নহে। আবার, তাহার উপর নিজেদের অজ্ঞতা ও আলস্যের জন্য এই কূপের জল আরও দূষিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশের কূপ বেশী গভীর নহে এই নিমিত্ত এই সকল কূপের তল হইতে জল অতি অল্পই উঠে। অধিকাংশ জলই চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি হইতে পরিস্রুত হইয়া পার্শ্ব দিয়া কূপের ভিতর পতিত হয়। এই চোয়ান জলের সহিত কোন দূষিত পদার্থ কূপের মধ্যে না আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কূপ যত গভীর হইবে ততই বেশী দূর হইতে জল চোয়াইয়া পড়িবে। কূপের পার্শ্বে বাসন মাজিলে বা কাপড় কাচিলে এই দূষিত জল কূপের মধ্যেই চোয়াইয়া পড়িবে। নিকটে পায়খানা থাকিলে তাহার ময়লা জলও চোয়াইয়া আসিয়া কূপের মধ্যে পড়িবে। স্নুতরাং কূপের জল ভাল রাখিতে হইলে এই সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে ঃ—

(১) কূপটি বাড়ীর এমন স্থানে দিবে যেন তাহার নিকটে পায়খানা, গোয়ালঘর ইত্যাদি না থাকে। কূপের উপর কোন গাছপালা যেন ঝুঁকিয়া না পড়ে। কারণ, তাহা হইলে ঐ গাছের পাতাগুলি কূপের ভিতর পড়িবে এবং জলে রৌদ্র লাগিবে না। কূপের জলে যেন বেশ রৌদ্র পায়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। (২) কূপের পাড়টি এমন করিয়া বাঁধিয়া দিবে যেন অনায়াসে জল গড়াইয়া দূরে চলিয়া যায়। ড্রেনগুলি সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত রাখিতে হইবে। পাকা ইঁদারা দিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ, তাহার ভিতর ময়লা জল পড়িবার আশঙ্কা থাকে না। (৩) কূপের পার্শ্বে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কার্য্য করিতে দিবে না। (৪) যে বাল্‌তি ও দড়ি দ্বারা জল তুলিবে তাহা সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত রাখিবে। যে ব্যক্তি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-ভাবে হাত পা ধৌত করে না, সাবধানতা-সহকারে ঐ দড়ি ও বাল্‌তি ব্যবহার করিতে জানে না, তাহাকে কখনও জল তুলিবে দিবে না। (৫) প্রতিবৎসর কূপের তলার পাঁক তুলিয়া ফেলিবে। (৬) কূপের জল খারাপ হইলে পার্ম্মাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ অথবা ব্লিচিং পাউডার দ্বারা কূপের জল শোধন করিয়া লইবে।

পুষ্করিণীর জল—পল্লীগ্রামে জলের জন্য কূপের পরেই পুষ্করিণীর উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বেশ ভাল পুকুর খুব কম গ্রামেই আছে। গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ পুকুর শুকাইয়া যায় বা জল এত কমিয়া যায় যে, ঐ জল স্নান বা পানের জন্য ব্যবহার করা চলে না। আবার কোন কোন পুকুর শেওলায়

পরিপূর্ণ। অন্য উপায় না থাকায় এই এঁদো পুষ্করিণীর জলই ব্যবহার করিতে হয়। তাহার পর, এই পুষ্করিণীর জল গ্রামের

পুষ্করিণীর জল কি প্রকারে দূষিত হয় ;
বৃদ্ধা এইরূপ জল পানার্থ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিতেছেন।

লোকেই আরও দূষিত করে। একই পুকুরে কেহ স্নান করে, কেহ কাপড় কাচে, কেহ বাসন মাজে—এমন কি, মলমূত্রযুক্ত বিছানাও ধোয়। ইহার উপর রাখালেরা গরু, মহিষাদি স্নান

করায়। এইরূপ দূষিত জল পান করিয়া লোকের যে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

পুকুরের জল ভাল রাখিতে হইলে এই কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে ঃ—

(১) পায়খানা প্রভৃতি নোংরা স্থানের নিকট পুকুর দিবে না। পুকুরের পাড়ে কখনও মলমূত্র ত্যাগ করিওনা। পুকুরের জলে মূত্রত্যাগ বা শৌচকার্য্য করিবেনা। (২) পানীয় জলের
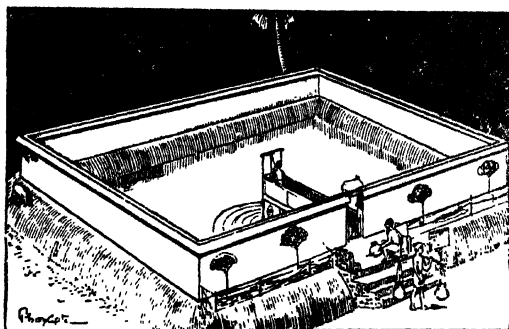
পানীয় জলের স্বতন্ত্র (রিজার্ভ্‌ড্‌) পুকুর

জন্য একটি পুকুর স্বতন্ত্র বা "রিজার্ভ্‌ড্‌" (Reserved) করিয়া রাখিবে। ইহাতে কাহাকেও স্নান করিতে বা কাপড়-চোপড় ধৌত করিতে দিবে না। স্নান করিবার প্রয়োজন হইলে উহা হইতে জল তুলিয়া স্নান করিবে। (৩) পুকুরের জলে রৌদ্র বা বাতাস লাগা প্রয়োজন। সুতরাং পুকুরের চারিদিকে গাছপালা লাগাইবে না, কারণ ইহাতে জলে রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে

পারিবে না এবং বৃক্ষাদির পাতা পড়িয়া জল খারাপ হইবে। (৪) পুকুরের পাড় বেশ উচ্চ করিবে, যেন চতুঃপার্শ্বের ময়লা জল গড়াইয়া পুকুরের ভিতর না আসে। (৫) পুকুরের ভিতর পানা, কচুরি, শেওলা ইত্যাদি জন্মিতে দিওনা। চারিদিকে কোন প্রকার গাছ-গাছরা রাখিবে না। মশায় ডিম পাড়িলে বা মশার বাচ্চা জলে দেখিলে প্রতিসপ্তাহে একদিন জলের কিনারায় কেরোসিন ভাসাইয়া দিবে, ইহাতে ঐ মশক-বাচ্চা মরিয়া যাইবে।

নদীর জল।—নদীর জল কিরূপে দূষিত হয় পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কতকগুলি কুপ্রথা আছে, যাহাতে নদীর জলও দূষিত হইয়া থাকে। মানুষের অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃতদেহ, গবাদির মৃতদেহ নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হয়। নদীর কিনারায় লোকে মলমূত্র ত্যাগ করে, উহা ধৌত হইয়া নদীর জলে মিশ্রিত হয়। অনেক সময় জলে পাট এবং বাঁশ ভিজান হয়। অবশ্য যে নদী প্রশস্ত এবং যাহাতে খরস্রোত আছে, সেখানে জীবাণু বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা বলিয়া নদীর জল হইলেই যে তাহা বিশুদ্ধ এবং পানের উপযুক্ত ইহা মনে করিতে নাই। নদীর জলও শোধন করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। কিরূপে জল শোধন করিতে হয় তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

দূষিত জল পানের জন্য কি কি ব্যাধি হইতে পারে।— দূষিত জলে ওলাউঠা, আমাশয়, উদরাময়, আন্ত্রিক জ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজাণু বা কীটাণু থাকিতে পারে এবং ঐ জল পান করায় উহা অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে। নানা

প্রকারের ক্রিমিকীট বা তাহাদের ডিম্ব এই দূষিত জলের দ্বারা সংক্রামিত হইয়া থাকে। ফিতা ক্রিমি (Tape worm), হুকপোকা (Hook worm), গিনি ক্রিমি (Guinea worm) এই প্রকারে সংক্রামিত হইয়া থাকে।

নানাবিধ জান্তব পদার্থ এবং উদ্ভিদ্-পদার্থের পচন-জনিত দুর্গন্ধ জলে পাওয়া যায়। এই প্রকারের গন্ধযুক্ত জল কখনও পান করিবে না, কারণ এই জলপানই সাধারণ উদরাময়ের কারণ হইয়া থাকে। আবার, যে জলে খনিজ পদার্থ বেশী থাকে তাহা পান করিলে পাথুরিয়া রোগ ও গলগণ্ড (goitre) রোগ হইয়া থাকে।

ওলাউঠা।—বঙ্গদেশের নিম্নভাগে নদীবহুল স্থানসমূহে ওলাউঠার প্রকোপ প্রায় বারমাসই দেখা যায়। বর্ষার পর যখন নানা কারণে জল দূষিত হইয়া থাকে, সেই সময় উহা সংক্রামক-ভাবে বিস্তার লাভ করে; আবার ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যখন অধিকাংশ খালবিল শুকাইয়া যায়, তখন যে সামান্য দূষিত জল পুকুর, খাল বা নদীতে পাওয়া যায় লোকে তাহাই পান করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য এই সময়ে ওলাউঠা রোগ প্রায় অধিকাংশ স্থানে সংক্রামকভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ বড় বড় সহরে জলের কল স্থাপিত হওয়ায়, তথায় ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

একমাত্র ফরিদপুর জেলায় গত তিন চার বৎসরের চেষ্টায় কতকগুলি ওলাউঠা-আক্রান্ত স্থানে নলকূপের জল প্রচলন হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে, অধিকাংশ গ্রামে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব আশাতীতরূপে কমিয়া গিয়াছে। তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিবে, যেন ওলাউঠা, আমাশয় এবং আন্ত্রিক জ্বর প্রভৃতি রোগাক্রান্ত বাড়ীর লোকদিগকে ঐ বাড়ীর ঘটি কি বাল্‌তি দ্বারা কখনও কূপের জল তুলিতে দেওয়া না হয়; কোন ঘটিতে রোগদুষ্ট জলমিশ্রিত দুগ্ধ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া সেই ঘটি উত্তমরূপে শোধন না করিয়া কূপের জল উঠাইতে দেওয়া উচিত নয়; কারণ, এই প্রকারে ময়লাযুক্ত হস্তের দ্বারা অথবা রোগ-বীজাণু-বিশিষ্ট পাত্রের দ্বারা কূপের জল দূষিত হইতে পারে।

আমাশয় ও আন্ত্রিক জ্বর।—অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, একই বাড়ীতে বা পল্লীতে এই রোগ একজনের পর আর একজনের হইতে থাকে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, উহাদের ব্যবহৃত জল (যাহা কূপ বা জলের কলের নল হইতে গ্রহণ করা হয়) তাহা ঐ রোগের কীটাণু বা বীজাণু দ্বারা দূষিত। গ্রামের অশিক্ষিত লোকেরা এই রোগের প্রকৃতি বুঝিতে পারে না বলিয়াই ওলাউঠা রোগীকে যে পাত্রে জল পান করিতে দেওয়া হইতেছে, সেই পাত্রেই আবার সুস্থ ব্যক্তিগণ জল পান করিয়া থাকে। এইরূপে একই বাড়ীতে বহুলোক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

জল ও জলপাত্র শোধিত না করিয়া কখনও ঐ বাড়ীর বা পল্লীর জল ব্যবহার করিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

জল শোধন-বিধি

ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান হইতে আমরা যে পানীয় জল গ্রহণ করিয়া থাকি তাহা সাধারণতঃ নির্দ্দোষ হয় না। যদি বৃষ্টির জলের প্রথম অংশ ত্যাগ করিয়া বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া উহা সংগ্রহ করা হয়, তবে তাহা সাধারণতঃ নির্দ্দোষ হয়। পরিস্রুত জল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। মানুষের বাসস্থান হইতে দূরে অবস্থিত পর্ব্বতগাত্র হইতে যে ঝরণা বা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয়, তাহার জলও বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত যে কোন স্থান হইতে জল গ্রহণ করা হউক না কেন, উহাতে অল্প-বিস্তর দূষিত পদার্থের সংমিশ্রণ থাকেই। জল সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ প্রকারে পরিষ্কৃত ও শোধিত হইয়া থাকে। যথা :—

(১) **প্রাকৃতিক নিয়মে জল-শোধন**।—জলাশয়ে অবস্থিত শেওলাজাতীয় গাছের দ্বারা, মৎস্যের দ্বারা এবং স্রোতের দ্বারা জল অনেক পরিমাণে শোধিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের তাপের দ্বারা এবং বায়ুর দ্বারাও জল অনেক পরিমাণে শোধিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত কূপ ও পুকুরের জলে যাহাতে রৌদ্র ও বাতাস লাগে তাহার ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

(২) **অগ্নির উত্তাপে জল-শোধন-বিধি**।—কোন পাত্রে জল অর্দ্ধঘণ্টা ফুটাইয়া লইলে উহা নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। এই

ফুটন্ত জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া শীতল পাত্রে চুয়াইয়া লইলে জল সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয়।

(৩) **নানাপ্রকার ফিল্‌টার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জল শোধন করা যায়।**—জল পরিষ্কার করিবার জন্য নানাবিধ ফিল্‌টার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে, সরকারী চিকিৎসালয়সমূহে এবং ডাক-বাঙ্গালায় ফিল্‌টার দেখিতে পাওয়া যায়। *এই ফিল্‌টারের অধিকাংশই বিদেশ হইতে* আমদানী হইয়া থাকে। কলিকাতার জলের কলে যে প্রণালীতে জল পরিষ্কৃত হয়, ঠিক তাহার অনুকরণে টিনের বাক্সের ভিতর সম্প্রতি ফিল্‌টার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হইতেছে। বাড়ীতে এরূপ ফিল্‌টার প্রস্তুত করিয়া জল রাখিবার বন্দোবস্ত করা ভাল। যে কোন প্রকার ফিল্‌টার হউক না কেন, উহা নিয়মিতরূপে পরিষ্কৃত করা নিতান্ত প্রয়োজন।

(৪) **বিশোধক দ্রব্যের সাহায্যে জল শোধিত করা যায়।**—পল্লীগ্রামের লোকেরা সাধারণতঃ পুকুরের জল ব্যবহার করে। ঐ পুকুরের জল কিরূপে নানাপ্রকারে দূষিত হয়, তাহার আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। পুকুরের জল উত্তমরূপে ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে। যে পুকুরে সংক্রামক রোগের বীজ সংক্রামিত হইয়াছে, তাহা স্বাভাবিক উপায়ে শোধন করিবার জন্য অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল রৌদ্রের তাপে রাখিতে হইবে এবং ঐ পুকুরে লোক নামিতে দিবে না। যদি অপর কোন জলাশয় না থাকে, তবে ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) বা

পার্‌মাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ দ্বারা ঐ জল শোধন করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইবে। ইঁদারা এবং কূপের জলও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধন করিয়া লইবে।

বার্কফিল্‌ড ফিল্‌টারের প্রধান অংশ উহার ভিতরকার ফাঁপা নলটি। উহা এরূপ ভাবে গঠিত যে, উহার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক ছিদ্র-পথে জল যাইবার সময় উহাতে যে সকল
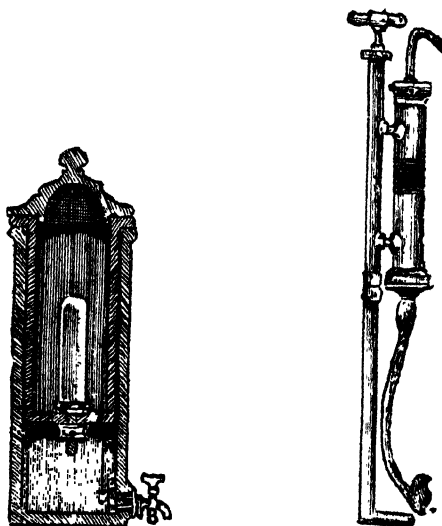
বার্কফিল্‌ড ফিল্‌টার

ময়লা বা বীজাণু থাকে তাহা ঐ রাস্তায় আটকাইয়া যায়। কিন্তু ইহার কার্য্য অতি মৃদুভাবে সম্পন্ন হয়। ঘোলা জল ব্যবহার করিলে শীঘ্রই উহার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এজন্য

প্রথমতঃ জলকে কিছুক্ষণ একটি পাত্রে অবস্থিত করাইয়া ভাসমান পদার্থসকল যখন তলানী পড়ে তখন ঐ জল ব্যবহার করা উচিত। ফাঁপা ফিল্‌টার-নলটি ব্রাস দ্বারা ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং কয়েকদিন পর পর উহা জলে সিদ্ধ করিয়া উহাকে পুনঃ পুনঃ শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। এই প্রকারে পরিষ্কার করার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; নচেৎ উহা ফাটিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

পাশ্চার চ্যাম্বারল্যাণ্ড ফিল্‌টারের মধ্যস্থিত সিলিণ্ডারটি পর্‌সেলিন-নির্ম্মিত এবং উহা বার্কফিল্‌ড ফিল্‌টারের ন্যায় প্রস্তুত। ইহাও প্রায় ৪।৫ দিন নিয়মিতভাবে কার্য্য করে এবং পরে জলে ফুটাইয়া শোধন করিয়া লইতে হয়।

ভাল ফিল্‌টারে নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা প্রয়োজন ঃ—

(১) ফিল্‌টারের প্রত্যেক অংশ হাতে খুলিয়া পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। (২) কোন অংশের অভাব হইলে, উহা শীঘ্র মিলিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। (৩) ফিল্‌টারের জল শোধন করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা চাই। (৪) ফিল্‌টারের জলে এমন কোন দ্রব্য আসিতে পারিবে না যাহাতে ক্ষুদ্র বীজাণু জন্মিতে পারে। (৫) ইহার জল-পরিষ্কারের ক্ষমতা বেশী দিন স্থায়ী হওয়া উচিত। (৬) ইহা নির্ম্মাণ করিতে এমন কোন দ্রব্য ব্যবহৃত হইবে না যাহা পচিয়া যায় বা জলের সহিত মিশিয়া যাহার গুণ নষ্ট করিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

সহরে ও পল্লীগ্রামে জল-সংরক্ষণ ও সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা

ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ বড় বড় সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ছোট ছোট মিউনিসিপ্যালিটি এবং বড় বড় গ্রামেও জলের কল বসাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। বৃহৎ মেলা এবং তীর্থস্থানেও জলের কল বসাইয়া শোধিত জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই সকল কলের জল সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী স্রোতস্বতী নদী, হ্রদ, সুবৃহৎ পুষ্করিণী অথবা নলকূপ হইতে গৃহীত হয়।

স্রোতস্বতী নদীর জল বর্ষাকালে অত্যন্ত ঘোলা হয় এবং নানা শ্রেণীর আবর্জ্জনা উহার উপর ভাসিয়া বেড়ায়। এই জল পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, উহা পানীয়রূপে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। এজন্য ঐ জলের কাদামাটি এবং অপরবিধ আবর্জ্জনাসকল দূরীকরণার্থ প্রথমতঃ ঐ জল একটি পুকুরের মধ্যে গ্রহণ করা হয় এবং ঐ পুকুর হইতে জল অপর একটি পুকুরে যাইবার ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থাটি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে, জল প্রথম পুকুরে আসিবার অন্তত ১৮ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় পুকুরে প্রবেশ করে। এইরূপে অধিকাংশ কাদা ও ময়লা প্রভৃতি ঐ পুকুরে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বিতীয় পুকুরে

আটকাইয়া যায়। এবংবিধ প্রণালীতে সংবৎসর কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য তৃতীয় আর একটি পুকুর প্রয়োজন হয়; কারণ প্রথম পুকুরটি কাদামাটীপূর্ণ হইলে সংস্কার করিবার জন্য শেষোক্ত পুকুরটির প্রয়োজন হয়। ময়লা বেশী পরিমাণে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত প্রথম পুকুরে জল ঢুকিবার সময় প্রতিগ্যালনে ৬ গ্রেণ ফিট্‌কিরি অথবা তদনুরূপ ফিট্‌কিরি ও লৌহের যৌগিক পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়।
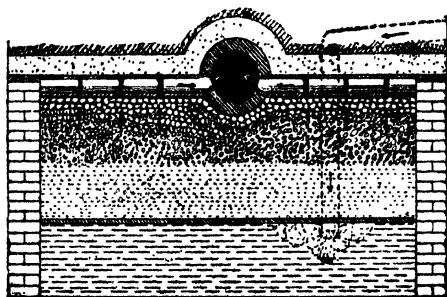
জলের কলে কিরূপে জল বিশুদ্ধ করা হয় (১৩২—১৩৩ পৃঃ)

উপরি-উক্ত ঔষধাদির সংমিশ্রণে অধিকাংশ ভাসমান ময়লা পুকুরে অধঃপতিত হয়। এই প্রণালীতে প্রাথমিক শোধন-কার্য্য সম্পাদিত হইলে দ্বিতীয় পুকুর হইতে জল ফিল্‌টার-সন্নিবেশিত চৌবাচ্চায় চলিয়া যায়।

এই চৌবাচ্চার নিম্নদেশে ফিল্‌টার-বেড অবস্থিত। এই ফিল্‌টার-বেডের উপর জল তিনচারি দিবস স্থিরভাবে অবস্থান করিলে, শেওলা প্রভৃতি দ্বারা ঐ ফিল্‌টারের বালুকাস্তরের

উপর একটি সূক্ষ্ম স্তর প্রস্তুত হয়। এই স্তরের এমন ক্ষমতা হয় যে, জল যে-কোন প্রকার রোগ-উৎপাদক জান্তব পদার্থ, কীটাণু বা বীজাণু বহন করিয়া আনুক না কেন, তাহা তথায় আটকাইয়া যায়। এইরূপে জল এই সূক্ষ্ম স্তরের ভিতর দিয়া নিম্নগামী হইয়া বালুকাস্তরে উপস্থিত হয়। তৎপর কঙ্করময় স্তর এবং খোয়াবিশিষ্ট স্তর অতিক্রম করিয়া পরিষ্কৃত জল একটি চতুর্দ্দিক্-বদ্ধ বড় চৌবাচ্চার ভিতর যাইয়া পোঁছে।

পরিষ্কার-জল-সংরক্ষণকারী চৌবাচ্চা হইতে পাম্পের সাহায্যে ঐ জল অনেক উচ্চ প্রদেশে লইয়া যাওয়া হয়। তথা হইতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যে এই জল সমগ্র সহরে বা পল্লীতে সরবরাহ করা হয়।

কালাই-করা লৌহ-নলের সাহায্যে সমস্ত সহরের রাস্তায় এবং বাড়ীতে জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। জল চলিবার রাস্তায় কোথায়ও দুর্গন্ধ গ্যাস সংমিশ্রিত না হয়, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়।

রাস্তার ধারে কিয়দ্দূর অন্তর অন্তর জল গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এজন্য মাঝে মাঝে জলের "হাইড্র্যাণ্ট" রাখা হয়; কারণ, অগ্নি নির্ব্বাপন এবং রাস্তায় জল দিবার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। রাস্তার জলের পাইপ হইতে বাড়ীতে যে সকল ছোট ছোট নল দ্বারা জল পাইবার ব্যবস্থা হয়, তাহা সাধারণতঃ সীসার দ্বারা প্রস্তুত; কারণ, উহার অনেক জায়গায় জোড়া দেওয়া এবং বক্র করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঐ জল

যদি সীসার উপর রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদন করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে অপরবিধ কালাইকরা লোহার নলের দ্বারা জল সরবরাহ করা সঙ্গত। কলিকাতা কর্পোরেশনের (Calcutta Corporation) জলের কল উপরি-উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত।

যে সমস্ত সহরে নলকূপের জল উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; তথায় ঐ নলকূপের জলই উপরি-উক্ত প্রণালীতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

গ্রামের জল-সরবরাহ।—বঙ্গদেশের জেলাসমূহের অধিকাংশ গ্রামে পানীয় জলের অবস্থা অতি শোচনীয়। এজন্য ওলাউঠা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের প্রকোপ তথায় অত্যধিক। ইহার প্রতিকারকল্পে গভর্ণমেণ্ট এবং জেলাবোর্ড সম্প্রতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। স্বল্পব্যয়ে গ্রামবাসিগণ যাহাতে উত্তম পানীয় জল পাইতে পারে তাহার জন্য সরকার হইতে বড় বড় পুকুর (Reserved tank) ও ইঁদারা খনন এবং নলকূপ বসান হইতেছে। গ্রামবাসীর সমবেত চেষ্টায় স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যেও অনেক গ্রামে নলকূপ বসান হইতেছে। ইহার ফলে, ঐ সকল গ্রামে ওলউঠা, আমাশয় প্রভৃতি রোগে মৃত্যু-সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। প্রতিগ্রামে এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, যে সকল সংক্রামক রোগের বীজাণু দ্বারা রোগ অল্প সময়ে বিস্তৃত হয়, তাহা অল্পসময়েই কমিয়া যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সহর এবং পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষা

আবর্জ্জনা ও মলমূত্র দূরীকরণ

সহরের স্বাস্থ্য-রক্ষা

সহরে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যকর বাটী নির্ম্মাণ, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ, এবং মলমূত্র ও আবর্জ্জনাদি দূরীকরণ প্রভৃতি নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রায় প্রত্যেক সহরেই মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃপক্ষের উপর স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকে। এই সকল কার্য্যে নগরবাসিগণের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। তাহাদের স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে অল্পবিস্তর জ্ঞান না থাকিলে এসকল কার্য্য সম্যক্ সুফলপ্রদ হয় না।

স্বাস্থ্যকর বাটী-নির্ম্মাণ

বাটী স্বাস্থ্যকর করিতে হইলে উহাতে যথেষ্ট আলো-বাতাস প্রবেশের সুবন্দোবস্ত করা দরকার। এইজন্য প্রত্যেক সহরেই কাহারও বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে উহা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে একটি নক্সা তৈয়ার করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিয়া স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর উপদেশমত উহা মঞ্জুর করাইয়া লইতে হয়। প্রস্তাবিত নক্সা অনুসারে নির্ম্মিত বাটী যদি

অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ তাহাতে প্রচুর আলো-বাতাসের এবং মলমূত্র ও আবর্জ্জনাদি দূরীকরণের বন্দোবস্ত না থাকে তবে সেই নক্সা কর্ত্তৃপক্ষ মঞ্জুর করেন না।

বিশুদ্ধ খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা

বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য অধিকাংশ সহরেই জলের কলের ব্যবস্থা আছে, যে সকল সহরে কলের জলের ব্যবস্থা নাই, সেখানেও মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক নলকূপ, পাকা ইন্দারা, স্বতন্ত্র রক্ষিত পুষ্করিণী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

খাদ্য সম্বন্ধেও বাজারে যাহাতে ভেজাল বা পচা খাদ্য বিক্রয় না হয় কর্ত্তৃপক্ষ তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ রাখেন। যাহাতে কোন খাদ্যে ধূলিবালি, মাছি ইত্যাদি না পড়ে সেজন্য দোকানে কাচের আলমারীতে খাবার রাখার উপদেশ ও আদেশ আছে।

অস্বাস্থ্যকর অবস্থা নিবারণ করার ব্যবস্থা

সহরের রাস্তায় বা লোকালয়ের নিকট কোন গর্ত্ত করিলে তাহা যাহাতে ভরাট্ করার ব্যবস্থা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; কোনস্থানে দুর্গন্ধ হইলে অচিরে তাহা নষ্ট করার ব্যবস্থা করিতে হয়। জীব-জানোয়ারের মৃত্যু ঘটিলে, তাহাও দূরে পৃথক্ স্থানে গাড়িয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়। পুকুরে বা আবদ্ধ জলাশয়ে যাহাতে মশকী ডিম্ব প্রসব না করে সে ব্যবস্থাও করা হয়। অস্বাস্থ্যকর

জঙ্গল কাটিয়া ফেলিবার ও পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকে। হাট-বাজারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর দৃষ্টি রাখা হয় এবং দুষ্টলোকে খাদ্যদ্রব্যাদিতে যাহাতে ভেজাল দিতে না পারে তজ্জন্য খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। মাংস বিক্রয় করার জন্য যেস্থানে পশুবধ করার ব্যবস্থা হয়, তাহাও নিয়মিত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকে। কোনপ্রকার ব্যবসায় যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে না পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। খাদ্যাদি প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে কোনও প্রকার ত্রুটী না হয় তাহাও দেখিবার ব্যবস্থা হয়। এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর অধীনে বিবিধ শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে; তাঁহারা ঐ সকল কার্য্য প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গরু ও ঘোড়ার জন্য গোয়ালঘর ও আস্তাবল যাহাতে স্বাস্থ্যকরভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং ঐসকল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

শবদাহ করার জন্য সহরের উপকণ্ঠে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা থাকে এবং ঐ স্থান নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখিতে হয়। মুসলমানদের গোড়স্থানও পৃথক্ স্থানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রাখার ব্যবস্থা থাকে।

সংক্রামক রোগ নিরারণকল্পে কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগীকে চিকিৎসা করার পৃথক্ বন্দোবস্ত থাকে। যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসার জন্যও পৃথক্ ব্যবস্থা করা হয়।

আবার ধাতুগত সংক্রামক রোগ গণোরিয়া বা দূষিত মেহ প্রভৃতির জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ঐ রোগগুলি যাহাতে ব্যাপ্ত না হয় সে চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ নিবারণকল্পে মশক ধ্বংস করার ব্যবস্থা এবং রোগীকে পৃথক্‌ভাবে মশারির ভিতর রাখিয়া কুইনাইন সেবন করাইয়া রোগমুক্ত করিয়া ঐরোগ নিবারণ করার চেষ্টাও তাঁহারা করিয়া থাকেন।

মলমূত্র ও আবর্জ্জনা দূরীকরণ

বাড়ীর মলমূত্র ও আবর্জ্জনা দূরীকরণের উপরই স্বাস্থ্য বেশীর ভাগ নির্ভর করে। সেইজন্য মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক ময়লা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতেই ময়লা পরিষ্কারের জন্য দুইপ্রকার বন্দোবস্ত আছে।

১। দৈনিক কার্য্যজনিত গৃহের আবর্জ্জনা—যেমন ছাই, ধূলা, তরকারীর খোসা, ঘর-বাড়ী ঝাট-দেওয়া ময়লা ইত্যাদি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা। এই সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করাকে **ঝাট দিবার ব্যবস্থা** (Scavenging) বলে।

২। মানুষের মলমূত্র পরিষ্কার করার **ব্যবস্থাকে মলশোধক** (Conservancy) উপায় বলে।

১। **ঝাট দিবার ব্যবস্থা**—উনানের ছাই, তরকারীর খোসা, ঘরবাড়ী ঝাট-দেওয়া জঞ্জাল, রাস্তা ঝাট দেওয়া জঞ্জাল ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার শুষ্ক আবর্জ্জনাকে পরিত্যক্ত দ্রব্য (refuse)

বলে। ঐ সকল পরিত্যক্ত দ্রব্য যথাসম্ভব সত্বর দূর না করিলে ওগুলি পচিয়া উহা হইতে দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু উত্থিত হইতে থাকে এবং উহাতে মাছি, ইন্দুর প্রভৃতির আবাস হয়। সুতরাং ঐগুলি অতি সত্বর দূর করা আবশ্যক।

যে সকল সহরে মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক ঐ সকল আবর্জ্জনা দূর করা হয়, সে সকল সহরে রাস্তার এক পাশে কিছু দূরে আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য এক একটা আধার (dustbin or ash-pit) স্থাপন করা হয়। উহার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী সকল বাড়ীর আবর্জ্জনা গৃহস্থেরা ফেলিয়া রাখেন। তারপর মিউনিসিপ্যালিটির ঝাড়ুদার আসিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া ঐ সকল ময়লা নিয়া যায়।

ঐ সকল আবর্জ্জনা দুই উপায়ে নষ্ট করা হয়, (১) পুঁতিয়া ফেলিয়া (dumping) এবং (২) পোড়াইয়া ফেলিয়া (incineration)।

১। **পুঁতিয়া ফেলা (Dumping)**—আবর্জ্জনা দ্বারা গর্ত্ত বা নীচু জমি ভরাট্ করাকে পুঁতিয়া ফেলা (dumping) বলে। সাধারণতঃ লোকালয়ের দূরেই এই প্রকারের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, সেখানে দূষিত বাষ্প, দুর্গন্ধ, মাছি, পোকা, প্রভৃতি কিছু না কিছু জন্মেই। বর্ষাকালে পুঁতিয়া ফেলার কার্য্য বন্ধ করা হয়। কিন্তু পুঁতিয়া ফেলার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। এই সকল আবর্জ্জনার স্তূপ মাঝে মাঝে পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

২। **পোড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা** (Incineration)—আবর্জ্জনা পোড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা খুব ভাল। ইহাকে ইংরাজীতে ইনসাইনারেসন (incineration) বলে। এই সকল আবর্জ্জনা পোড়াইবার জন্য নানাপ্রকার চুলা ব্যবহৃত হয়। তাহাদিগকে ধ্বংসকারী চুলা (Destructor Furnace or incinerator) বলে। এই সকল আবর্জ্জনা ভালরূপ দগ্ধ করিবার জন্য উহাদের সঙ্গে কয়লা বা অন্য কোন জ্বালানি মিশাইয়া দেওয়া হয়। গোশালা হইতে গোবর সংগ্রহ করিয়া তাহা শুকাইয়া জ্বালানি করিলে ব্যয়সংক্ষেপ হইতে পারে। ঐ সকল আবর্জ্জনা পোড়াইলে তাহার মধ্যে যে শক্ত কয়লা হয়, তাহা দ্বারা সাধারণতঃ রাস্তা তৈয়ার করা হয়। ঐগুলি গুড়া করিয়া তাহার সহিত চূণ মিশাইলে সিমেণ্ট হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আবর্জ্জনা নষ্ট করার এই ব্যবস্থায় ব্যয়ও তেমন বেশী নয়, অথচ ইহা স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। পোড়াইবার ব্যবস্থা লোকালয় হইতে দূরে করা কর্ত্তব্য।

মলশোধক পদ্ধতি (Conservancy)—মানুষের মলমূত্র পচিতে না দিয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থানে সরাইয়া ফেলার ব্যবস্থা করাকে (conservancy) বলে। মনুষ্যাবাসের নিকটে মলমূত্র বেশীক্ষণ থাকিতে বা পচিতে দেওয়া উচিত নয়। মানুষের মলমূত্র একজায়গায় জমিলে তদ্দারা জল, বায়ু ও মাটী দূষিত হয়, তাহাতে রোগ-বীজাণু, কৃমি ও মাছি জন্মে

এবং উহাদের দ্বারা নানারোগ বিস্তার লাভ করে। যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিলেও সেই মল হইতে কলেরা, অজীর্ণ, আমাশয়, ক্রিমি, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের বীজ বিস্তৃত হইয়া সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সুতরাং কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মল ত্যাগ করিয়া তাহা সত্বর সরাইয়া ফেলা একান্ত কর্ত্তব্য।

সকল সহরেই মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ মল দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কলিকাতা ও অন্য দুই একটি সহর ব্যতীত অধিকাংশ সহরেই মেথর দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করা হয়। প্রত্যেক বাড়ীর পায়খানার তলায় এক একটি গামলা বসান থাকে, ঐ গামলায় সমস্ত দিনের মল সংগৃহীত হয়, এবং প্রত্যেক দিন মেথরেরা প্রত্যেক বাড়ীর গামলা হইতে মল ঢালিয়া নিয়া মল পুঁতিবার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় (trenching ground) নিয়া যায়। শেষরাত্রেই এই নিয়মে মল দূরীকরণের ব্যবস্থা সাধারণতঃ হইয়া থাকে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে মল নিয়া যাওয়ার পর দুই উপায়ে উহা নষ্ট করা যাইতে পারে। এক উপায়, গর্ত্ত (trenching) করিয়া তাহার মধ্যে মল ঢালিয়া দিয়া সেই মলের উপর আবার মাটী চাপা দেওয়া। আর এক উপায়, সম্পূর্ণভাবে মল পোড়াইয়া ফেলা। আমাদের দেশের সকল মিউনিসিপ্যালিটিতেই মল পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়।

মেথর দ্বারা পায়খানার মল পরিষ্কার করাইলেও পায়খানার দোষে অনেক মলমূত্র পচিয়া স্বাস্থ্যের হানি করে। সুতরাং

পায়খানা নির্ম্মাণ-সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

(১) পায়খানাটি এমনভাবে প্রস্তুত করা উচিত যেন মলমূত্র বা শৌচাদির জল আপনা হইতেই নীচস্থ পাত্রে পড়িতে পারে অর্থাৎ যেন পায়খানার কোন অংশে মলমূত্র আটকাইয়া থাকিতে না পারে, এবং এজন্য ঝাড়ু দেওয়া দরকার না হয়।

(২) পায়খানায় বসিবার স্থান এবং মলমূত্রের গমলা রাখিবার স্থান পাকা করিয়া গাঁথিয়া তাহার উপর পুরু করিয়া সিমেণ্ট লাগাইয়া দেওয়া উচিত, যেন উহার ভিতর দিয়া জল শুষিয়া মাটীতে প্রবেশ করিতে না পারে।

(৩) মলের সহিত প্রস্রাব ও শৌচের জল যাহাতে মিশ্রিত না হয় সেইজন্য মল ও জলের জন্য দুইটি পৃথক্ গামলা থাকা উচিত।

এইরূপ আরও আবশ্যক বিধি-ব্যবস্থা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ও উপদেশ অনুসারে সম্পন্ন করিতে হয়।

উপরে যে পায়খানার কথা বলা হইল তাহাই সাধারণতঃ ছোট ছোট সহরে প্রচলিত। কলিকাতা ও তদ্রূপ বড় সহরে **ড্রেন পায়খানা** আছে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর পায়খানায় সাইফার প্যান নামক এক প্রকার অতি মসৃণ সাদা পাত্র বসান থাকে। ঐ পাত্রের মধ্যাংশে জল থাকে, সুতরাং মলত্যাগ করা মাত্রই তাহা ঐ জলে পড়ে। আবার ঐ পায়খানা ধৌত করিবার জন্য জলের ট্যাঙ্ক উপরে বসান থাকে। সেই

ট্যাঙ্কটি এমনভাবে প্রস্তুত যে, সর্ব্বদা তাহা হইতে জল পড়ে না। কিন্তু হাতল ধরিয়া টান দিলে অত্যন্ত জোরে প্যানের মধ্যে জল পড়িয়া পায়খানার ময়লা ধোয়াইয়া লোহার পাইপের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া দেয়। তৎপর ঐ ময়লা যাইয়া রাস্তার নিম্নে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড ড্রেনে পড়ে। কলিকাতায় ঐরূপ বড় ড্রেন বহিয়া সকল ময়লা যাইয়া বিদ্যাধরী নদীতে পড়ে। বিদ্যাধরী নদীতে পড়িবার পূর্ব্বেই ড্রেনের ভিতর ময়লা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়। পরে বৃহৎ জলাশয়ের জলের দ্বারা উহার দোষ ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়; এই জন্য ঐ নদীর জল সহসা নষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসীদের অনিষ্ট সাধন করে না।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী গঙ্গার দুইধারে পাটের কলে **সেপটিক ট্যাঙ্ক** নামক এক প্রকার পায়খানা ব্যবহার করা হয়। বিশিষ্ট জাতীয় জীবাণু দ্বারা এই সকল পায়খানার কঠিন মল তরল করা হয়, ব্লিচিং পাউডারের দ্রাবণের সহিত মিশ্রিত করিলে উহা নির্দ্দোষ হয়; তৎপর উহা গঙ্গার জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সকল পায়খানার তরল মলে যদি ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত করা না হয়, তাহা হইলে গঙ্গার জল দূষিত হইতে পারে। এই কার্য্য নিয়মিত চলিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা কারার জন্য সরকার হইতে স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।

পয়ঃপ্রণালী (Drainage)—যাহাতে বৃষ্টির জল বা বাড়ীর বাসন প্রভৃতি ধোয়া জল জমিয়া আবদ্ধ থাকার দরুণ মশা

ডিম পাড়িবার সুযোগ না পায় এ ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক বাড়ী হইতে পয়ঃপ্রণালী আনিয়া রাস্তার বড় ড্রেনে মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং এমনভাবে ঢালু করিয়া উহা প্রস্তুত করা হয় যাহাতে জল সর্ব্বদা নিম্নমুখে চলিতে পারে। পায়খানার জল প্রভৃতিও ঐ নর্দ্দমা দ্বারা বাহিরে চলিয়া যায়। বড় কোন জলাশয় থাকিলে তাহাতে ঐ ময়লা জল ফেলিবার ব্যবস্থা হয়। তথায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে ঐ জল সূর্য্যের উত্তাপ ও মুক্ত বাতাসে শোধিত হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের ব্যবস্থা—প্রতিসহরেই মাঝে মাঝে খোলা স্থান প্রভৃতি রাখিয়া লোকে যাহাতে সকালে বৈকালে ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা হয়। খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলার মাঠের ব্যবস্থাও অনেকস্থলে আছে। সংক্রামক রোগীদিগের থাকিবারও পৃথক্ বন্দোবস্ত থাকে।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষা

সহরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কম বেশী সম্ভবমত অনেকটা ঐভাবেই করিতে হয়। তবে গ্রামের সকল বিষয়ে ঐভাবে কার্য্য পরিচালন করা সম্ভব নয়, অবস্থা-বিশেষে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রতিজেলায় একটি জেলা বোর্ড,

প্রতি মহকুমায় একটি লোক্যাল বোর্ড এবং প্রতিথানায় একটি পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রতি জেলা বোর্ডে স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ দিবার জন্য একজন স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী (ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ আফিসার) নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অধীনে প্রতিথানায় পল্লীস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য একজন সহকারী স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী বা স্যানিটারী ইনস্পেক্টর নিয়োগ করা হইয়াছে। বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইনের বিধানমতে স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারী স্বাস্থ্য-রক্ষার যে যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহাও সহরের ন্যায় কতকাংশে করা হয়। চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রভৃতির ব্যবস্থা, উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা, সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা, হাটবাজার পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রভৃতি সেখানেও যথাসম্ভবভাবে করা হয়। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের বিধানমতে কার্য্য করার জন্য স্যানিটারী ইনস্পেক্টর স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড বা পঞ্চায়েত সমিতিতে নিয়মিত উপদেশ প্রদান করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় ১৬।১৭ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করার ফলে এখন ইহার উপকারিতা সমাজের লোকে অনেকটা বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহারা এখন বুঝিতেছেন যে, অকালমৃত্যুর হাত হইতে ও সংক্রামক রোগের কবল হইতে নিজেদের চেষ্টার দ্বারাই মুক্তি পাইতে পারা যায়।

গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :—(১) উচু-নীচু স্থান সমান করিয়া

প্রণালীবদ্ধ ভাবে খোলা **পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা ময়লা আবদ্ধ জল দূরীকরণের** ব্যবস্থা করা।

(২) **পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত** করার জন্য ছোট রকম জলের কল, নলকূপ বা ইন্দারার ব্যবস্থা করা ও স্নান বা অপরবিধ গৃহকার্য্য করার জন্য পুকুরের ব্যবস্থা করা।

(৩) **মলমূত্রাদি দূরীকরণের ব্যবস্থা** অধিকাংশ স্থানে ব্যায়সাধ্য, এজন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পায়খানা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা বর্ত্তমানে প্রচলন করা আবশ্যক।

(৪) **আবর্জ্জনা প্রভৃতি দূরীকরণের সুব্যবস্থা করা।**

(৫) **যাতায়াত ও বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা**—গ্রামের ভিতর প্রশস্ত রাস্তা সোজাভাবে বায়ু-চলাচল করিতে পারে এমনতর ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। উহার পাশে পয়ঃপ্রণালী রাখার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক বাড়ীর পয়ঃপ্রণালী ঐ রাস্তার পয়ঃপ্রণালীতে আসিয়া মিলিত হয় এবং তথাকার জল নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা বিলের ভিতর ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। কোথায়ও জল আবদ্ধ না থাকে সে ব্যবস্থা করিতে হয়।

গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য গ্রাম্য স্বাস্থ্য-সমিতি গঠন করা প্রয়োজন এবং আবশ্যক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে করা যাইতে পারে।

ছোটবেলা হইতে স্বাস্থ্যের নিয়ম মানিয়া চলিবার জন্যই তোমাদিগকে স্বাস্থ্য-পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তোমরা স্বাস্থ্য-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া যদি নিয়মানুসারে ঘর, বাড়ী, রাস্তা, ঘাট, পয়ঃপ্রণালী, পায়খানা, জঙ্গলাদি পরিষ্কার করা এবং জলাশয়গুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রাখার ব্যবস্থা করিতে পার, তবেই তোমাদের গ্রাম স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে পার। অবশ্য, তোমাদের নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যবস্থার উপর এ সকল ব্যবস্থা বিশেষ-ভাবে নির্ভর করিতেছে। তোমরা যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিবে না, থুথু ফেলিবে না, পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে; শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিলে উহাতে সংক্রামক রোগ প্রবেশ করিতে পারে না, বসন্ত রোগ নিবারণের জন্য টীকা গ্রহণ করিলে জীবনেও বসন্ত রোগ হয় না। পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিলে ও খাবারে মাছি বসিতে না পারিলে কখনও যক্ষ্মা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ হয় না।

পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত নলকূপে হইতে পারে, ইন্দারা থাকিলে তাহা মধ্যে মধ্যে শোধন করিয়া লইবে। পুকুরের জল পান করিতে হইলে উহা সিদ্ধ করিয়া পান করাই সমীচীন।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পায়খানা প্রস্তুত করা সম্ভব না হইলে প্রতিইউনিয়ন বোর্ড যদি একটি যন্ত্র ৫০।৬০ টাকায় ক্রয় করিয়া প্রত্যেকের বাড়ীতে গর্ত্ত পায়খানার প্রচলন করিয়া দেয়, তবে মলত্যাগের জন্য কোন প্রকার দোষ থাকিবে না। এবিষয়ে স্বাস্থ্য-বিভাগের লোকেরা সর্ব্বদা উপদেশ দিতেছেন। নিয়মিতভাবে সেবাদল বা স্বেচ্ছাসেবকদল অথবা ব্রতচারী দল গঠন করিয়া

গ্রাম্য লোকদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিলে যেখানে সেখানে বাহ্য করার কুফল নিবারণ করা সম্ভব হয়।

ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে যে সকল উপদেশ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করিলে গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল করা খুব সহজ হয়। এজন্য স্বাস্থ্য-বিভাগ সরকারী সাহায্য আনিয়া দিয়া থাকেন।

গৃহগুলির পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাতে সর্ব্বদাই স্বাস্থ্যপ্রদ হয় সে ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রকার করিতে হইলে প্রত্যেকের সহানুভূতি ও কর্ম্ম করার প্রবৃত্তি থাকা চাই। এজন্য গ্রামে পল্লীমঙ্গল-সমিতি গঠন করিয়া স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশমত কার্য্য করিলে সুবিধা হয়। প্রত্যেক গ্রামে মশার বংশ ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, খাল, ডোবা বন্ধ করিয়া ফেলিতে হয়; হাঁড়ীকুড়িতে বৃষ্টির জল জমিয়া মশার বৃদ্ধি না হয় তাহা দেখিতে হয়। কোন স্থান যাহাতে স্যাঁতসেঁতে না হয় সে ব্যবস্থা না করিলে ম্যালেরিয়া ও বাত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মলমূত্র, আবর্জ্জনাদি নষ্ট করিবার বা দূর করিবার সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। তাহা পরে বলিতেছি।

গ্রামের মলমূত্র-আবর্জ্জনাদি দূরীকরণ

গ্রাম্য পায়খানা।—গ্রামের অধিকাংশ লোকই মাঠ বা নদীর ধারে মলত্যাগ করে। ইহা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস;

কারণ, ইহাতে মলের উপর মাছি পড়ে, সেই মাছিগুলি মল হইতে নানাপ্রকার ব্যাধির বীজ বিস্তার করে। তা'ছাড়া, মাঠে মল ত্যাগের জন্যই প্রধানতঃ হুকওয়ার্ম রোগ সংক্রামিত হয়। নদীর ধারে মল ত্যাগ করিলে নদীর জল দূষিত হয়।

গ্রামে যাহারা মাঠে মলত্যাগ করে না, তাহাদের বাড়ীতে এক প্রকার পায়খানা থাকে, তাহাকে 'কূয়া পায়খানা' বলে। সেগুলির গঠন অনেকটা সহরের 'মেথর খাটা' পায়খানারই মত। যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা পাকা গাঁথুনির পায়খানা করে; তা'ছাড়া অপর সকলে কাঠের ফ্রেমের উপর টিনের ছাদ দিয়া পায়খানা নির্ম্মাণ করে। এগুলির ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য কোন বন্দোবস্ত থাকে না। একটি গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যেই বরাবর মলত্যাগ চলিতে থাকে। মলমূত্র এবং শৌচ জল সবই একই জায়গায় পতিত হইয়া এমন বীভৎস ও দুর্গন্ধপূর্ণ হইয়া উঠে যে, পায়খানায় বসিয়া মলত্যাগ করাও কঠিন হইয়া উঠে। আবার কোন কোন পায়খানার ছাদও থাকে না। সুতরাং বৃষ্টির জল পড়িয়া পায়খানার তলদেশ আরও নোংরা হইয়া উঠে। এই পায়খানাগুলি স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া যেমন অপকারী, ব্যবহারের পক্ষেও তেমনি অসুবিধাজনক।

এই পায়খানাগুলি এমনভাবে নির্ম্মাণ করা উচিত যে, প্রস্রাব এবং শৌচজল যেন মলে না পড়ে। তা'ছাড়া প্রত্যেক দিনের মলগুলি মাটী বা ছাইচাপা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত।

মেলা বা যোগের সময় একপ্রকার অস্থায়ী পায়খানার ব্যবস্থা করা হয়। সেগুলিকে **পগার** (French latrine) **পায়খানা** বলে। এগুলি তৈয়ার করিতে বেশী কষ্ট নাই; ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহার উপর আবরণ দিয়া ঘিরিয়া অস্থায়ী পায়খানা নির্ম্মাণ করা হয়। গর্ত্তের মধ্যে মলত্যাগের পর, মলের উপর শুষ্ক মাটী ছড়াইয়া দিয়া মল ঢাকিয়া দেওয়া হয়। একটি গর্ত্ত ভরিয়া গেলেই ঐ পায়খানা কিছুদূর সরাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং, গ্রাম্য লোকেরাও যদি এইরূপ পায়খানার বন্দোবস্ত করে, তবে যেমন উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ হয়, তেমনি ব্যবহারেও বিরক্তিকর হয় না।

খাটা পায়খানায় গামলা বা বালতি বসাইয়া মলত্যাগের ব্যবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয় বলিয়া আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে মলশোধক পায়খানা তৈয়ার হয়, তাহাতে একপ্রকারের বীজাণু দ্বারা মলগুলি জলে পরিবর্ত্তিত হয়। এজন্য উহাতে দুর্গন্ধ হয় না এবং উহাতে জল এমনভাবে বাহির করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হয়, যাহাতে কোনও প্রকার সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে না। ইহাতে খরচও খুব বেশী নয়।

গ্রাম্য পরিত্যক্ত শুষ্ক আবর্জ্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা—

(Disposal of dry refuses in villages)—সহরে যে প্রকার প্রত্যেক বাড়ীর দৈনিক আবর্জ্জনা দূর করার জন্য মেথর আছে, পল্লীগ্রামে সেরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই। পল্লীগ্রামে সকলেই বাড়ীর আবর্জ্জনা নিকটস্থ কোনস্থানে জড় করিয়া

রাখে। ঐ স্থানকে আঁস্তকুড় বলে। ঐ স্থানের আবর্জ্জনা পচিয়া নানরূপ দূষিত বায়ু উত্থিত হয়, দুর্গন্ধ জন্মে এবং উহা মাছি ও নানাপ্রকার ব্যাধির বীজের আকর হয়। ফলে উহা স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়।

দুই উপায়ে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারেঃ—(১) বাড়ীর আবর্জ্জনাগুলি একটি গর্ত্তে ফেলিয়া তাহার উপর প্রতিদিন শুষ্ক মাটীর গুড়া বা ছাই ছড়াইয়া ঢাকিয়া দিলে উহা হইতে দুর্গন্ধ বা দূষিত বায়ু উত্থিত হইতে পারে না এবং মাছিও জন্মিতে পারে না। (২) প্রত্যেক দিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনার সহিত কিছু দাহ্য পদার্থ মিশাইয়া যদি আবর্জ্জনা প্রত্যহ পোড়াইয়া ফেলা হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা। গোশালার গোময় প্রভৃতিও ঐরূপ পোড়াইয়া ফেলা উচিত। অথবা প্রত্যহ গোময় একটি গর্ত্তে ফেলিয়া মাটী চাপা দিয়া ঢাকিয়া দিলে কিছু দিন পরে তাহা উত্তম সারে (manure) পরিণত হয়।

গ্রাম্য ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থা—গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে ময়লা জল নিকাশের বন্দোবস্ত থাকা উচিত। বৃষ্টির জল, স্নানের জল, রান্না ঘরের জল, বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ময়লা জল যাহাতে একটি নর্দ্দমা দিয়া বাড়ীর বাহিরে যাইয়া পড়িতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। বাড়ীর উঠান ও কূয়ার চারিদিকে ঢালু করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত।

নর্দ্দমাগুলি এমনভাবে প্রস্তুত করা দরকার, যেন বাড়ীর ময়লা জল কোনস্থানে আবদ্ধ না থাকে এবং নিকটবর্ত্তী কোন খাল, বিল বা মাঠে যাইয়া পড়ে। নালা বা নর্দ্দমায় ঘাস, জঙ্গল জন্মিয়া বা মাটী পড়িয়া উহা আবদ্ধ করিয়া না ফেলে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। নর্দ্দমা রীতিমত ঢালু এবং নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না বলিয়া অনেক বাড়ীর জল বাহির হইতে পারে না এবং তাহাতে আবর্জ্জনা পচিয়া দুর্গন্ধ হয় এবং উহা রোগবীজাণুর আকর হইয়া উঠে। নর্দ্দমা বেশী গভীর করিলে উহার মধ্যে ময়লা পরিষ্কার করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়। তজ্জন্য অল্প গভীর করিয়া উহার তলদেশ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া ঢালু করিবে।

গ্রামে যে সকল সরকারী নর্দ্দমা থাকে তাহা অনেকস্থলেই ঢালু ও পরিষ্কার করার ব্যবস্থার অভাবে তাহাতে নানাবিধ আবর্জ্জনা পচিয়া নানাপ্রকার স্বাস্থ্যহানির কারণে পরিণত হয়। ইহার প্রতিকার করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কতকগুলি সাধারণ ব্যাধি—তাহাদের চিকিৎসা ও নিবারণের উপায়

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ—শীত ও কম্প হইয়া জ্বর আসে, শীতের সময় খুব জলপিপাসা হয়। তাহার পর সমস্ত শরীর এত গরম হয় যে, হাতে তাপ সহ্য হয় না। সময় সময় বমি হয়। শীত কমিয়া গেলে দাহ হয়। কয়েকঘণ্টা এই অবস্থা থাকার পর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়ে।

ম্যালেরিয়া জ্বর বিভিন্ন প্রকারের আছে। কোন কোন রোগীর প্রায় প্রত্যহ একই সময় জ্বর আসে। আবার কাহারও কাহারও আগাইয়া বা পিছাইয়া জ্বর প্রকাশ হইতে দেখা যায়। আবার কাহারও কাহারও একদিন বা দুইদিন পর পর জ্বর আসে। কোন কোন অবস্থায় আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় প্রায় একভাবেই জ্বর ভোগ হইতে দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া রোগে কিছুদিন ভুগিলে রোগীর শরীর শীর্ণ এবং মুখ ফ্যাঁকাশে হয়। বুক ও পাঁজরার হাড় ভাসিয়া উঠে। শরীরে একটুও বল থাকে না। পেট প্লীহা, যকৃতে ভরিয়া যায়। শরীরে রক্তাল্পতা হয়, রোগী খুব নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিলে রোগ-কীটাণু (ম্যালেরিয়া

প্যারাসাইট্) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই পরীক্ষা করিয়া অনতিবিলম্বে নিয়মিত সুচিকিৎসা করিলে রোগ আরোগ্য করা সম্ভবপর হয়।

ম্যালেরিয়ার নিবারণের উপায়—তোমরা পূর্ব্বে শিখিয়াছ যে, এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রীমশকদ্বারা ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত
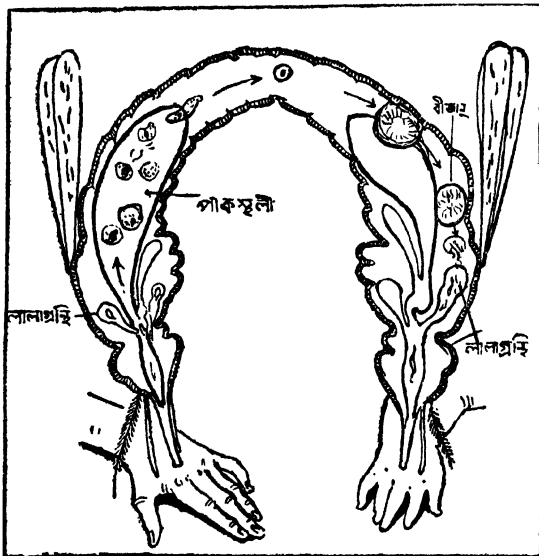
ম্যালেরিয়া-সংক্রমণ—এনোফিলিস মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া পরে সুস্থ্যব্যক্তিকে দংশন করিতেছে

হইয়া থাকে। কোন ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে এনোফিলিস মশক কামড়াইবার পর যদি ১২।১৩ দিবস পরে উহা অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করে, তবে সেই সুস্থ ব্যক্তিরও ম্যালেরিয়া

পল্লীগ্রামে মশকের জন্মস্থান — ম্যালেরিয়া বিস্তার

জ্বর ঐরূপ দংশনের ১২।১৩ দিন পর প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সুতরাং ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হইতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ থাকা চাই। যথা—

(১) স্ত্রী জাতীয় এনোফিলিস মশা—এই মশা না থাকিলে ম্যালেরিয়া ছড়াইতে পারে না, কারণ ইহারাই ম্যালেরিয়া জ্বরের একমাত্র বাহক। মশা না থাকিলে ম্যালেরিয়াও থাকিবে না (No mosquito, no malaria)।

(২) ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত রোগী—ম্যালেরিয়া হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নিকটে কোথাও ম্যালেরিয়ার রোগী আছে। যে স্থানে ম্যালেরিয়ার রোগী নাই এরূপ স্থানে ২।১ দিনের জন্যও যদি ম্যালেরিয়ার রোগী আসেন, তবে তিনি ঐ স্থানে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারেন। অপর পক্ষে, সুস্থ ব্যক্তি যদি ২।১ দিনের জন্য ম্যালেরিয়াযুক্ত স্থানে আসেন, তবে তিনিও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইতে পারেন।

সুতরাং ম্যালেরিয়া জ্বর দূর করিবার তিনটি উপায় আছে ঃ—

(১) যদি সমস্ত মশা নির্ম্মূল করা যায়।

(২) যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, মশা কাহাকেও দংশন করিতে পারে না।

(৩) যদি সমস্ত ম্যালেরিয়া রোগী সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা যায়।

ইহা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে,—

(ক) মশার সংখ্যা যদি হ্রাস করা যায়, অথবা তাহাদের

দংশন হইতে মানুষকে রক্ষা করা যায়, তবে ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগী কমিয়া যাইবে।

(খ) ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমাইতে পারিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিস্তারের সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে।

সুতরাং ম্যালেরিয়া জ্বর নিবারণ করিতে হইলে তিনটি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক :—

১। মশকের বংশ নির্ম্মূল করা।—

সমস্ত মশক নির্ম্মূল করা এক প্রকার অসম্ভব। তবে সুবিধার বিষয় এই যে, একটি মশক অধিকদিন বাঁচে না। এই অবস্থায় আমরা যদি মশকের বংশবৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারি, তবে মশকের উপদ্রব হইতে অনেকট রক্ষা পাওয়া যায়। তোমরা শিখিয়াছ যে, আবদ্ধ জলেই মশকী ডিম পাড়ে। সুতরাং গ্রামে বা সহরে যে সকল গর্ত্ত, ডোবা প্রভৃতি আছে তাহা যদি বুজাইয়া ফেলা হয়, গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা হয়, পুকুরের কিনারায় লতা-গুল্ম প্রভৃতি জন্মিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়, পুকুর বা অন্য যে সকল ডোবা বুজান হয় নাই, তাহার কিনারার জলে প্রতিসপ্তাহে একবার কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দেওয়া হয়, নর্দ্দমাগুলিতে যাহাতে জল দাঁড়াইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়, তবে মশকের বংশবৃদ্ধি হইতে পারে না। এই কার্য্য করার জন্য সম্প্রতি গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠিত হইয়াছে, স্কুলে ব্রতচারী দল গঠন করা হইয়াছে এবং স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষকদের উপদেশমত ঐ মশককুল ধ্বংস করিয়া গ্রামের প্রভূত উন্নতি করিতেছে।
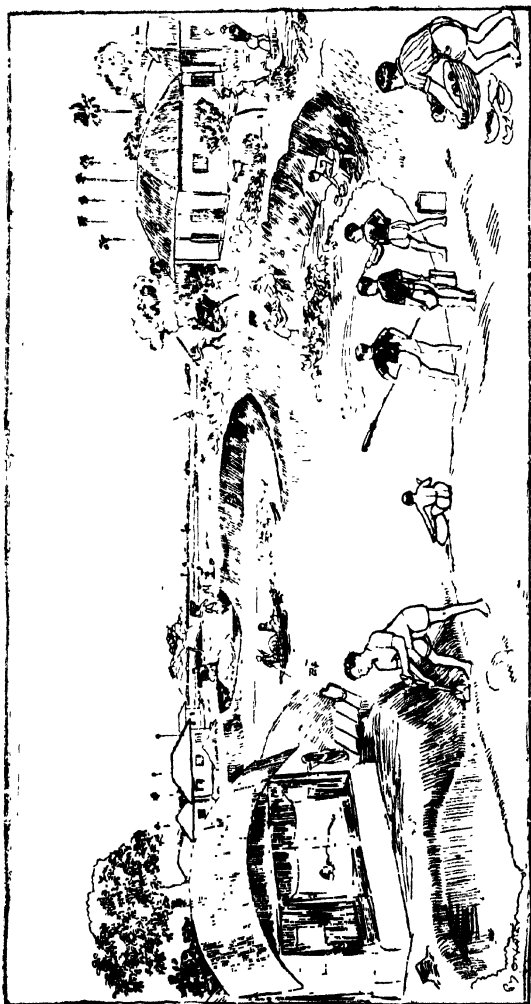
ঐ দেখ, ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য গ্রামের ছেলেরা জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছে, বদ্ধ জলে কেরোসিন ছিটাইতেছে, আবদ্ধ জল বাহির করিয়া দিতেছে, আরো কত কিছু করিতেছে।

২। মশার দংশন হইতে আত্মরক্ষা করা।—

মশকের দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সন্ধ্যার পরে যথাসম্ভব পুরু বস্ত্রদ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। শয়নের সময় সর্ব্বদাই মশারী ব্যবহার করিতে হইবে। ইউক্যালিপ্‌টাস্ তৈল (Eucalyptes oil), লেবুর তৈল (Lemon grass oil), সাইট্রানেলী তৈল (Citronella oil), দারুচিনির তৈল (Essence of Cinamon) প্রভৃতি উগ্র গন্ধ তৈল শরীরে মাখিলে মশার কামড় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ঘরে আলকাতরা মাখান নেকড়া রাখিলেও মশার উপদ্রব অনেকটা কমে। এতদ্ব্যতীত, ঘরে অনেক জিনিষ জড় করিয়া রাখা উচিত নয়। ঘরে যাহাতে প্রচুর আলো বাতাস খেলিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় প্রচুর পরিমাণে ধূপ-ধুনা দিয়া ঘর হইতে মশক তাড়ান উচিত।

৩। ম্যালেরিয়া রোগী নিরাময় করা।—

ম্যালেরিয়ার বীজাণু নষ্ট করার জন্য কুইনাইন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে নিয়মিতভাবে কুইনাইন ব্যবহার করা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া রোগ যাহাতে বিস্তারলাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য রোগীকে দূরে সরাইয়া রাখা উচিত। কখনও তাহার সহিত বসা বা এক মশারীতে শয়ন করা উচিত নয়। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে যাহাতে মশকে কামড়াইতে না পারে তাহারও বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। যদি প্রত্যেক অধিবাসীর এই প্রকার ব্যবস্থা করা সম্ভব

হয় এবং এই নিয়মেবাস করার অভ্যাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়ার কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে।

ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)

Bacillus Tuberculosis নামক বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া যে সকল রোগ উৎপাদন করে তাহাদিগকেই Tuberculosis বলে। এই বীজাণু শরীরের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত রোগ উৎপাদন করে এবং তদনুসারে ঐ সকল রোগের বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ বীজাণু দ্বারা ফুসফুস আক্রান্ত হইয়া যে রোগ জন্মে তাহাকে Phthisis বা Consumption বলে। ঐ বীজাণু গলদেশের উভয় পার্শ্বস্থ শ্লৈষ্মিক গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া, চর্ম্ম-আশ্রয় করিয়া, মস্তিষ্ক আশ্রয় করিয়া, আন্ত্রিক গ্রন্থি আশ্রয় করিয়া, এবং অস্থি বা অস্থিসন্ধি আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রোগ উৎপাদন করে। মানুষ এবং সমস্ত গৃহপালিত পশুই এই বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। একমাত্র ছাগই এই বীজাণুর আক্রমণ নিবারণ করিতে সক্ষম।

কিরূপে সংক্রামিত হয়—

বায়ুর সঙ্গে বীজাণু শ্বাসপথে প্রবেশ করিলে অথবা খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে উহা উদরে প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ক্ষয়কাসে রোগীর কফ, কাসি, থুথুতে ; গ্রন্থিপীড়ায়

পূঁযে; চর্ম্ম-পীড়ায় আক্রান্ত স্থান-নিঃসৃত রস ও পূঁযে; এবং আন্ত্রিক পীড়ায় মলে এই রোগের বীজাণু থাকে।

নিবারণের উপায়—

(১) যে প্রকার ক্ষয়রোগের বীজ রোগীর দেহনিঃসৃত যে সকল মলে থাকে, সেই সকল মল অতি সাবধানে রাখিয়া বিশোধক দ্রব্য মিশাইয়া অবিলম্বে পোড়াইয়া ফেলিবে।

(২) রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিবে।

(৩) রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র, বিছানা বা বাসনপত্র কেহ কখনও ব্যবহার করিবে না।

(৪) রোগীর গৃহে উন্মুক্ত আলো-বাতাসের সুব্যবস্থা করিবে।

(৫) রোগীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিবে না।

(৬) রোগীর পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মা—(Phthisis or Consumption)

কারণ—ক্ষয়রোগের জীবাণু (Bacillus Tuberculosis) সাধারণতঃ প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে।

গৌণ কারণ—পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, অধিক পরিশ্রম, রুদ্ধ গৃহে বাস, অল্প পরিসর স্থানে বহু লোকের বাস, স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস, অতিরিক্ত ধূলা, পাট, তামাক, চূণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম কণাযুক্ত এবং ধূম্যযুক্ত, বিশেষতঃ নানাপ্রকার তীব্র পদার্থের ধূম্যযুক্ত বায়ু সেবন, বায়ু-প্রবাহহীন এবং রৌদ্র-বিহীন স্থানে বাস

প্রভৃতি নানা কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া যায়, সে অবস্থায় ক্ষয়কাসের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া সহজেই রোগ উৎপন্ন করিতে পারে।

লক্ষণ—(১) চব্বিশ ঘণ্টা জ্বর থাকে, অথবা বৈকালে স্বল্প জ্বর হয়। (২) গভীর রাত্রে, এমন কি, শীতকালেও প্রচুর ঘাম হয়। (৩) শরীর ক্রমশঃ ক্ষয় হওয়ায় দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। (৪) সকল সময়েই কাসি থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে কাসি নির্গত হয়; উহা গিলিলে পেটের পীড়া জন্মে। (৫) এই রোগে ফুস-ফুসে ঘা জন্মে, সেই ঘা হইতে পূঁযের মত গয়ার এবং কখনও কখনও মুখ দিয়া রক্ত উঠে। কিন্তু সকল কাসে রক্ত উঠে না।

কিরূপে রোগ বিস্তার হয়—

(১) যক্ষ্মারোগের বীজাণু প্রধানতঃ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া রোগীর শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে। ক্ষয়-রোগীর কফ ও থুথুর সহিত অসংখ্য রোগ-বীজাণু নির্গত হয়। ঐ কফ, থুথু না পোড়াইয়া অসাবধানে যেখানে সেখানে ফেলিলে তাহা শুকাইয়া ধূলার সঙ্গে মিশে। সেই ধূলার সহিত ক্ষয়-রোগের জীবাণু সংলগ্ন থাকে এবং শ্বাসপথে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া এই রোগ উৎপন্ন করে।

(২) রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদিতে অল্পবিস্তর কফ লাগিয়া থাকিতে পারে। সেই সকল বস্ত্রাদি সংলগ্ন কফ, থুথুর অভ্যন্তরস্থ বীজাণু দ্বারাও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

(৩) ক্ষয়রোগী কাসিবার সময় অথবা নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় তাহার নাক মুখ হইতে রোগ বাজাণু নির্গত হয়, উহা বায়ুকে দূষিত করে। নিকটস্থ কোন ব্যক্তি ঐ দূষিত বায়ু প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে তাহার ঐ রোগ জন্মিতে পারে।
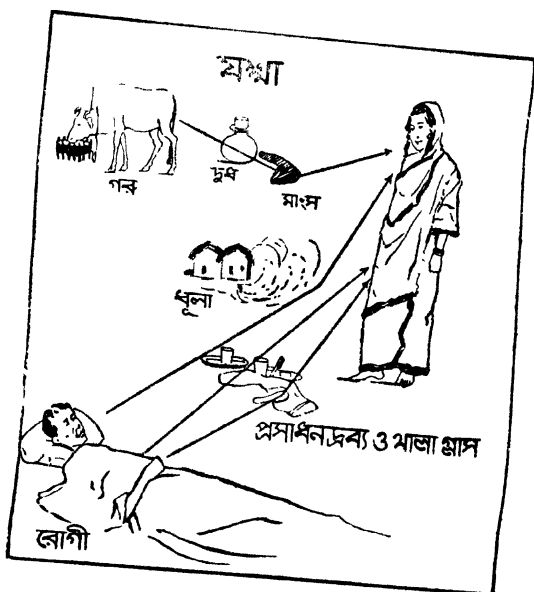
কিরূপে যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত হয়

(৪) বায়ু ব্যতীত জল ও খাদ্যের সাহায্যেও ক্ষয়রোগের সংক্রামণ ঘটিতে পারে। জলাশয়ের জলে বা জলাশয়ের নিকটে ক্ষয়রোগীর কফ, থুথুজড়িত বস্ত্রাদি কাচিলে সেই জল দূষিত হয়। এইরূপ বীজাণু-দূষিত জল পান করিলে ক্ষয়রোগ জন্মিতে পারে।

(৫) রোগীর কফ ও থুথুতে বা কফ-থুথুমাখা বস্ত্রাদিতে পিপীলিকা, মাছি, আরসুলা প্রভৃতি বসিলে তাহদের শরীরে অনেক রোগ-বীজাণু সংলগ্ন হইয়া যায়। পরে ঐ সকল জীব খাদ্যে বসিলে সেই খাদ্য বীজাণু-দূষিত হইয়া পড়ে। সেই খাদ্য কোন সুস্থ ব্যক্তি আহার করিলে তাহারও ক্ষয়রোগ জন্মিতে পারে।

(৬) দেখা যায়, ছাগ ব্যতীত অন্যান্য গৃহপালিত পশুরও ক্ষয়রোগ জন্মে এবং তাহাদের মাংসে ঐ রোগের বীজাণু থাকে। সেই মাংস উত্তমরূপে সিদ্ধ না করিয়া খাইলে ক্ষয়রোগ জন্মিতে পারে।

(৭) গাভীর ক্ষয়রোগ হইলে তাহার দুগ্ধে ঐ রোগের বীজাণু থাকে এবং সেই দুগ্ধ পান করিলে ক্ষয়রোগ জন্মে।

(৮) শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে যদি সেই স্থানে ক্ষয়রোগীর কফ, থুথু লাগে তাহা হইলেও ক্ষয়রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐ রোগ জন্মাইতে পারে।

নিবারণের উপায় ও চিকিৎসা

(১) কাহারও ক্ষয় রোগ জন্মিলে তাহাকে স্যানাটোরিয়ামে (Sanatorium) পাঠান কর্ত্তব্য। অশক্ত হইলে রোগীকে একটি পৃথক্ ঘরে রাখিবে। সেই গৃহের সমস্ত আসাবাব-পত্র পূর্ব্বেই বাহির করিয়া ফেলিবে এবং ঘরে রৌদ্র-বাতাস খেলিবার জন্য সর্ব্বদা দরজা-জানালায় পরদা টানাইয়া তাহাতে বিশোধক

দ্রাবণ ছড়াইয়া দিবে এবং প্রত্যহ ঐ পর্দ্দা লাইসল-মিশ্রিত জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে।

(২) রোগীর ব্যবহারের বাসনপত্র স্বতন্ত্র রাখিবে এবং ব্যবহারের পর উষ্ণ আধঘণ্টকাল কড়া লাইসল দ্রাবণে ভিজাইয়া রাখিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। (৩) রোগীর ঘরে শুশ্রূষাকারী ও চিকিৎসক ব্যতীত অপর কেহ যাইবে না। শুশ্রূষাকারীদের বস্ত্রাদি এবং পান ভোজনের পাত্রাদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিবে।

(৪) রোগীর ঘরে কয়েকটি পাত্রে কড়া লাইসল দ্রাবণ রাখিবে এবং সেই পাত্র ভিন্ন অন্য কোথাও রোগীর মল, মূত্র, গয়ার প্রভৃতি ফেলিবে না। ঐ পাত্রগুলি সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে ; পরে ঐ কফ, থুথু ইত্যাদি পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৫) রোগীর বস্ত্রাদি কাচিবার পূর্ব্বে এক ঘণ্টাকাল কড়া লাইসল দ্রাবণে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সাবান জলে ফুটাইয়া পৃথক্ স্থানে কাচিয়া পৃথক্ স্থানে শুকাইবে।

(৬) শুশ্রূষাকারী ও রোগীর স্বতন্ত্র দাস-দাসীরা কখনও পাকশালায় প্রবেশ করিবে না এবং অপরের ব্যবহারের কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ইহারা রোগীর যে কোন প্রকারের পরিচর্য্যা করার পরেই সাবান ও লাইসল দ্বারা হস্তপদ পরিষ্কার করিবে।

(৭) বাড়ীতে যাহাতে মাছির উপদ্রব না হয়, তজ্জন্য বাড়ীর নিকটে কোন আর্জ্জনা রাখিবে না। খাদ্যদ্রব্য সকল সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে।

(৮) সুস্থ ব্যক্তিগণ পুষ্টিকর সহজ পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করিবে। প্রচুর সূর্য্যকিরণ ও উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিবে। কাহারও উচ্ছিষ্ট পাত্রে ভোজন বা পান করিবে না। ধূলা, ধোঁয়া অন্ধকার ও আর্দ্রস্থান, লোকের ভিড়—এই সকল স্থানে কখনও যাইবে না। দুগ্ধ ফুটাইয়া পান করিবে। কাঁচা দুগ্ধ বা কাঁচা দুগ্ধের মাখন খাইবে না।

শরীরের শক্তি বাড়াইয়া তোলাই ক্ষয়রোগ দূর করিবার এক-মাত্র উপায়। তজ্জন্য রোগী (১) প্রতিদিন পুষ্টিকর ও উত্তম খাদ্য খাইবে। ক্ষয় কাসের রোগীর পক্ষে ডিম, দুধ, দুধের সর ভালরূপ সিদ্ধ করা ভাত, টাটকা শাকসব্জী ও ফলমূল অতিশয় উপকারী।

(২) সকল সময়ে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে।

(৩) সর্ব্বদা খুব স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকা ক্ষয়রোগ আরোগ্য করিবার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক।

রোগীর জ্বর থাকিলে কোন প্রকার নাড়াচাড়া করা উচিত নহে। জ্বর না থাকিলেও বেশী চলাফিরা করিবে না।

'মল্ট একষ্ট্রাক্ট' মিশ্রিত কড্‌লিভার আরোক এইরোগে বিশেষ ফলদায়ক।

রোগীর প্রাতঃকালে কাসির বেগ হইলে প্রতিদিন সকালে আহারের পূর্ব্বে পনর গ্রেণ সোডা এক গেলাস গরম দুধে বা জলে মিশাইয়া পান করিবে।

রোগীর জ্বর হইলে অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দ্বারা তাহাকে আধঘণ্টাকাল স্পঞ্জ করিবে।

মুখ দিয়া রক্ত পড়িলে রোগী চুপ করিয়া থাকিবে। রক্তের মাত্রা বেশী হইলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলে একখণ্ড কাপড় ভিজাইয়া বুকের সম্মুখভাগে দিতে থাকিবে।

বসন্ত (Small Pox)

বসন্ত রোগকে সংস্কৃত ভাষায় মসূরী বা মসূরিকা বলে। ইংরাজীতে ইহার নাম Small Pox। বাংলা দেশে ইহা কখনও কখনও সংক্রামক (epidemic) ভাবে এবং কখনও কখনও স্থানীয় সংক্রামক (endemic) ভাবে দেখা দেয়।

বসন্ত রোগের লক্ষণ—এই রোগের আটটি বিভিন্ন অবস্থা আছে—

(১) উপ্তাবস্থা (Period of incubation)—রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করার পর ৯ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে রোগের স্পষ্ট লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় না। রোগবীজ শরীরে প্রবেশ করার পর হইতে রোগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের অবস্থাকে রোগের উপ্তাবস্থা বলে।

(২) আক্রমণ অবস্থা (Period of invasion)—এই অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হঠাৎ শীত বোধ হয়এবং খুব বেশী জ্বর হয়। জ্বরের সঙ্গে অত্যন্ত মাথাব্যথা, পিঠব্যথা, পিপাসা, অনিদ্রা, বমি প্রভৃতি লক্ষণও থাকে। শিশু সন্তানের জ্বর হইলেই তড়্কা হয়।

(৩) জ্বর হওয়ার পর দ্বিতীয় দিনে গায়ে হাত দিলে চামড়ার নীচে ছিটাগুলির মত বোধ হয়।

(৪) জ্বর হওয়ার ৪৪ ঘণ্টা পরে কপালে, মুখে ও হাতের কব্জীতে গুটি দেখা দেয় এবং ক্রমে সমস্ত শরীরে গুটি বাহির হইতে থাকে। এই অবস্থাকে গুটি হওয়ার অবস্থা বলে। শরীরে গুটি দেখা দিলেই জ্বর কমিয়া যায়।

(৫) গুটিকা প্রকাশ হওয়ার তিন দিন পর তাহাদের ভিতর জলীয় পদার্থ (Serum) সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। এই তিন দিনে গুটিকাগুলি ঈষৎ বড় হয় এবং উচ্চতায় বৃদ্ধি পায়। গুটিকাগুলি তখন স্ফোটকের ন্যায় দেখায় বলিয়া এই অবস্থাকে স্ফোটক অবস্থা বলে। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে গুটিগুলি পূর্ণস্ফোটকে পরিণত হয় এবং জ্বর একেবারে ছাড়িয়া যায়।

(৬) গুটিকা প্রকাশের পর সপ্তম বা অষ্টম দিবস হইতে স্ফোটকগুলির জলীয় পদার্থ ক্রমে পূঁযে পরিণত হইতে থাকে এবং গুটির উপরে টোপ পড়ে, ঐ গুটিকাগুলির ভিতর পূঁযের কতকাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় রোগীর দ্বিতীয়বার জ্বর হয়। এই দ্বিতীয় বারের জ্বরে রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে এবং তখন আনুষঙ্গিক অপরাপর উপসর্গও উপস্থিত হয়। এই অবস্থাই খুব বিপজ্জনক; কারণ, এই সময়েই রোগীর মৃত্যু হইবার খুব আশঙ্কা থাকে। এই অবস্থাকে পূঁয হওয়ার অবস্থা বলে।

(৭) দ্বিতীয় বারের জ্বর ত্যাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূঁযপূর্ণ গুটিকাগুলি সুপক্ক অবস্থায় শুষ্ক হইয়া চটা বাঁধিতে থাকে এবং রোগী ক্রমে সুস্থ বোধ করে। এই অবস্থাকে চটা বাঁধার অবস্থা (Scale-formation stage) বলে।

(৮) গুটিকাগুলি ক্রমে শুষ্ক হইলে, ২০।২৫ দিনের ভিতর উহার খোসাগুলি (Crust) পড়িয়া যাওয়ায় চর্ম্মের ভিতর ঈষৎ গার্ত্তপনা দাগ (Scar) হয়। এই অবস্থাকে শুষ্ক হওয়ার অবস্থা এবং খোসা পড়িয়া যাওয়ার অবস্থা বলে।

কিরূপে রোগ-সংক্রমণ হয়

বসন্ত রোগের বীজ প্রত্যক্ষভাবে (directly) বসন্ত রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির সংস্পর্শিত দ্রব্যাদি হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে। (১) পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, বসন্ত রোগের বীজ বায়ুর সাহায্যে রোগীর বাসস্থান হইতে এক মাইল কি তদধিক দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইয়া তন্মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিসমূহকে আক্রমণ করে। (২) রোগীর নিঃশ্বাস, থুথু, কাস, পুঁয ও পামরিগুলি প্রচুর রোগবীজে পরিপূর্ণ থাকে; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ সকলের সংস্পর্শে আসিলে বসন্ত রোগ জন্মিয়া থাকে। (৩) রোগীর শরীরে অথবা তাহার ত্যাজ্য থুথু, কাসি বা বস্ত্রাদিতে মশা, মাছি প্রভৃতি বসিলে তাহাদের শরীরেও রোগবীজ লাগিয়া যায়। ঐ মশা, মাছি কোন সুস্থ ব্যক্তির

শরীরে বসিলে তাহাদেরও ঐ রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। (৪) রোগীর ব্যবহৃত বিছানা, জামা, কাপড়, থালা, বাটি ইত্যাদি যে কোন জিনিষে রোগ-বীজাণু লাগিয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্য শোধন না করিয়া কেহ স্পর্শ বা ব্যবহার করিলে তাহার
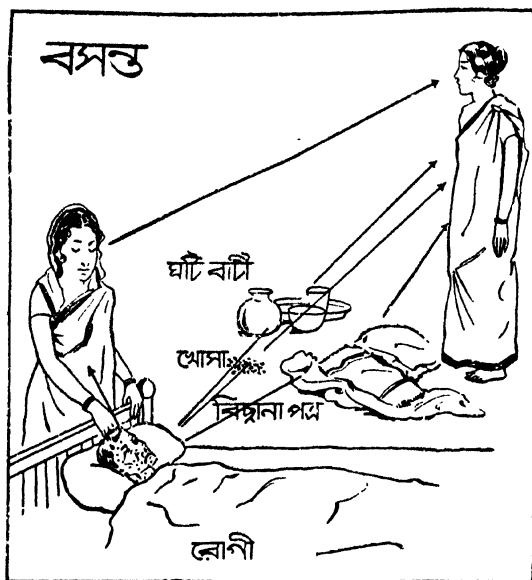
কিরূপে বসন্ত রোগ সংক্রামিত হয়।

শরীরেও ঐ রোগ-বীজাণু প্রবেশ করিয়া থাকে। (৫) রোগীর শুশ্রূষাকারী বা মৃতদেহ-সৎকারকারিগণের শরীরে রোগবীজাণু সংক্রামিত হইতে পারে।

নিবারণের উপায়

(১) কোন গ্রামে বা বাড়ীতে বসন্ত রোগ দেখা দিলে অবিলম্বে গ্রামবাসিগণ এবং বাড়ীর সকল লোক বসন্ত রোগের টীকা গ্রহণ করিবে।

(২) যাঁহারা রোগীর সেবা বা চিকিৎসা করেন, তাঁহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই টীকা গ্রহণ করিবেন।

(৩) রোগীকে কোন একটি পৃথক্ নির্জ্জন ঘরে, সম্ভব হইলে দোতালায় বা বহির্ব্বাটীতে রাখিতে হইবে।

(৪) রোগীর নিকট হইতে মশা, মাছি তাড়াইয়া রোগীকে মশারি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

(৫) রোগীর ব্যবহৃত বাসন-পত্র সর্ব্বদাই পৃথক্ স্থানে ধুইবে এবং রীতিমত শোধন না করিয়া অপর কোথাও লইয়া যাইবে না, বা তাহা কেহ ব্যবহার করিবে না।

(৬) রোগীকে পরিবর্ত্তিত বস্ত্রাদি গরমজলে না ফুটাইয়া পুনরায় ব্যবহার করিতে দিবে না এবং রীতিমত শোধন না করিয়া উহা ধোপার বাড়ীও পাঠাইবে না।

(৭) রোগীর শরীর পরিষ্কার করিবার জন্য যে সমস্ত ন্যাকড়া আদি ব্যবহার করা হয়, তাহা এবং রোগীর থুথু, কাস ইত্যাদি বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত করিয়া তৎপর পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৮) হেল্‌থ অফিসার বা স্যানিটারী ইন্সপেক্টার যে পর্য্যন্ত না বাড়ীটিকে নিরাপদ বলেন, সে পর্য্যন্ত রোগী, তাহার শুশ্রূষাকারী, বাড়ীর ছেলেমেয়ে, চাকরদিগকে বা বাড়ীর

অন্য কাহাকেও বাড়ীর বাহিরে, হাটে, বাজারে, স্কুলে বা অফিসে যাইতে দিবে না ((Quarantine)।

(৯) রোগীর মৃত্যু ঘটিলে মৃতদেহ বিশোধকদ্রাবণ সিক্ত কাপড়ে আবৃত করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিবে।

দেশীয় মতে বসন্ত রোগের চিকিৎসা—বসন্তের গুটি বসিয়া গেলে রোগীর অবস্থা খারাপ হয় এবং অনতিবিলম্বে মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা থাকে। গুটি যাহাতে বসিয়া না যায় তজ্জন্য জ্বর বিরাম হইলে ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে তূলা বা ন্যাকড়া ভিজাইয়া রোগীর গায়ে একবার মাত্র জলের ছোটা দিবে। ইহাতে গুটিগুলি শরীরে বসিয়া যায় না। ঐ দিন বৈকালে বা পরদিন প্রাতে ঐ প্রকার জলে কাঁচা হলুদ ফুলের কুড়ি উত্তমরূপে বাটিয়া তাহার সহিত তেলাকুচা পাতার রস ও টক ছানার জল মিশাইয়া মিহি কাপড়ে ছাকিয়া লইবে। তৎপর উহাতে বোরিক তূলা ভিজাইয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিবে। পরদিন যখন দেখা যাইবে যে, গুটিগুলি সম্পূর্ণ উঠিয়াছে তখন রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বোরিক তূলা দ্বারা ননী বা মাখন মাখাইয়া দিবে।

স্ফোটকে পূঁয জন্মিলে সূঁচ দ্বারা গালিয়া দিবে। বিশোধক ঔষধ মিশ্রিত তৈল বোরিক তূলা ভিজাইয়া তাহা দ্বারা ঐ পূঁয মুছিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলিবে। রোগীকে গ্রীষ্মকালে শীতল এবং শীতকালে উষ্ণ রাখিবার উপায় অবলম্বন করিতে

হইবে। বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চলনের পথ অবরুদ্ধ না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। প্রাথমিক জ্বরের সময় অত্যন্ত কোষ্ঠ-বদ্ধতা থাকিলে মৃদু বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবে। রোগীর মস্তিষ্কের উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে আদা, তুলসীপাতার রস ও পোলতার রসসহ মকরধ্বজ সেবন করিবে।

আধুনিক প্রণালীতে বসন্তরোগে আইওডিন ইঞ্জেকসন দ্বারা বিশেষ সুফল হইয়া থাকে।

বসন্ত রোগে রোগীর চক্ষুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এইজন্য প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর বোরিক লোসন দ্বারা রোগীর চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে।

গলার ভিতর গুটি বাহির হইলে পটাশ পারমাঙ্গানেট জলে মিশাইয়া তাহা দ্বারা মুখ ও গলার মধ্যে কুলি করিয়া দিনে ৩/৫ বার ধুইয়া ফেলিবে।

কলেরা (Cholera)

'কমা' বেসিলাস নামক একপ্রকার জীবাণু দ্বারা কলেরা রোগ জন্মিয়া থাকে, ঐ জীবাণু দেখিতে (') কমার ন্যায় বলিয়া ঐ জীবাণুকে 'কমা' বেসিলাস বলে। খাদ্য ও পানীয়ের সহিত ঐ বীজাণু অন্ত্রের ভিতর প্রবেশ করিয়া তথায় সর্পবিষের ন্যায় একপ্রকার জান্তব বিষাক্ত রস (Toxin) প্রস্তুত করে এবং এই বিষ রক্তের ভিতর প্রবেশ করিবার ফলে বিষক্রিয়া প্রকাশ

পাইতে থাকে। স্বাভাবিক শক্তিতে ঐ বিষ মনুষ্য দেহহইতে বাহিরে আসিবার জন্য চেষ্টা করে এবং ভেদ ও বমন দ্বারা তাহা প্রকাশ পায়।
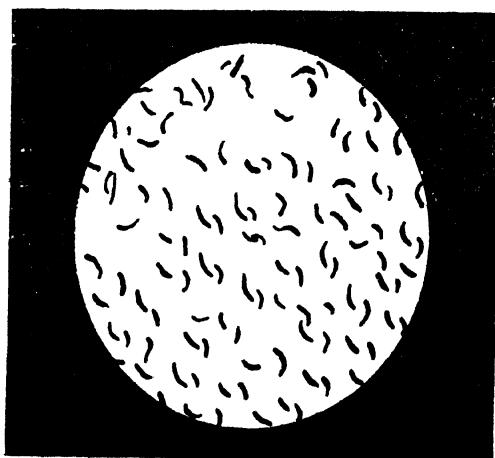
কমা বেসিলাস

কলেরা রোগের লক্ষণ—কুমড়াপচা জল বা পান্তা ভাতের আমানি অথবা চাউলধোয়া জল অথবা ফেনের মত ভেদ ও জলবৎ গন্ধবিহীন বমন হওয়া কলেরা রোগের প্রধান লক্ষণ। উপরোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা দিতে থাকে ঃ—

(১) অবসন্নতা (Depression)।

(২) চোখ কোটরগত হইয়া যাওয়া (Sunken eyes)।

(৩) পিপাসা (Thirst)

(৪) মূত্ররোধ (Supression of urine)

(৫) স্বরভঙ্গ (Hoarseness of voice)

(৬) নাড়ীর ক্ষীণতা এবং ক্রমশঃ লোপ (Sinking of pulse)

(৭) হিমাঙ্গ (Collapse)

(৮) অঙ্গুলী-প্রান্ত নীলবর্ণ হওয়া (Cyanasis)

(৯) চটচটে ঘাম (Cold clammy perspiration)

(১০) শ্বাসকষ্ট (Difficult breathing)

(১১) হাতে পায়ে খিল ধরা (Cramps)

(১২) মূত্ররোধ হওয়ার দরুণ বিকার লক্ষণ।

এই সকল লক্ষণগুলি ক্রমে প্রকাশ পাইয়া রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিয়া ফেলে।

কলেরা রোগের বিস্তারের কারণ—নিম্নলিখিত উপায়ে কলেরা রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে :—

১। **স্পর্শ দ্বারা**—হস্ত দ্বারা কলেরা রোগীর গাত্র, দূষিত বস্ত্র ও শয্যাদি স্পর্শ করিলে 'কমা' বেসিলাস হস্তে লাগিয়া থাকে। হস্তের নখ বড় থাকিলে নখের ভিতর ঐ জীবাণু থাকিবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

২। **জলের দ্বারা**—গ্রাম্য পুষ্করিণী বা নদী প্রভৃতিতে অজ্ঞতাবশতঃ কলেরার মল নিক্ষেপ করা হয়, কলেরার দূষিত বস্ত্রাদি ধৌত করা হয় এবং অনেকস্থলে অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকেরা রোগীর মৃতদেহ নিয়মিত সৎকার না করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ

খাদ্যদ্রব্যে বসিয়া মাছি প্রায়ই খাদ্যের উপর মলত্যাগ করে। এই প্রকারেও মাছি দ্বারা খাদ্যদ্রব্য দূষিত হয়। কলেরা রোগীর মল-মূত্রাদি পোড়াইয়া না ফেলিলে তাহাতে অনেক সময় পিপীলিকা বসিয়া তাহাদের শরীরে কলেরার জীবাণু সংগ্রহ করে। ঐ প্রকার পিপীলিকা দ্বারাও খাদ্যদ্রব্য কলেরা জীবাণুদুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার দূষিত খাদ্যদ্রব্য ভোজনে কলেরা রোগ জন্মিয়া থাকে।

৬। **দোকানের ও ফেরিওয়ালার বিক্রীত খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা**—কলেরা রোগীর মল যেখানে সেখানে ফেলিলে তথায় মাছি বসে। ঐ মাছি অসাবধান দোকানদার ও ফেরিওয়ালার অনাবৃত খাদ্যদ্রব্যে পড়িয়া খাদ্যদ্রব্যকে দূষিত করে।

৭। **কলেরা-বাহক দ্বারা**—যে লোক একবার কলেরা রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে, অথচ উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা নিয়মিত ভাবে চিকিৎসিত হইবার সময় পায় নাই, তাহার পেটের ভিতর কলেরার বীজাণু অনেক বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে পারে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সাধারণতঃ, ঐ বীজাণু ঐ লোকের তেমন ক্ষতি না করিলেও তাহার মল দ্বারা পানীয় জল বা খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাদিগকে **কলেরা-বাহক** (Carrier) বলা হয়। এই প্রকার লোকের হাতে তৈয়ারী খাদ্য অথবা তাহাদের মল দ্বারা দূষিত জল হইতে কলেরা রোগ ছড়াইয়া পড়ে।

কলেরা রোগ নিবারণের উপায়—(১) প্রথমে কলেরা রোগীকে স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিবে, রোগীর ঘরে শুশ্রূষাকারী ভিন্ন অপর কাহাকেও আসিতে দিবে না।

(২) যাহাদের বাড়ীতে কলেরা রোগী আছে তাহাদিগকে সাধারণের জলাশয়ে নামিতে দিবে না এবং কূপ বা ইন্দারা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিবে।

(৩) গ্রামে কলেরা বা উদরাময় রোগ দেখা দিলে পানীয় জল ও দুধ কখনও **না** ফুটাইয়া ব্যবহার করিবে না। যে সকল স্থানে কলের জল বা নলকূপের জল খাওয়া হয় সেই সকল জলও ফুটাইয়া ব্যবহার করা ভাল।

(৪) হাট-বাজার বা দোকানের কোন খাবার খাইবে না। ফুটন্ত জলে, বিশোধিত পাত্রে, পরিষ্কৃত হস্তে প্রস্তুত খাদ্য ভিন্ন অন্য খাদ্য খাইবে না। খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।

(৫) অম্লরস 'কমা' বীজাণুনাশক; সুতরাং যাহাতে প্রত্যহ সকালে পাকস্থলীতে স্বাভাবিক অম্লরস ক্ষরণ হইতে পারে, তজ্জন্য ভিজান চিড়া, তেঁতুল ও চিনি এবং তৎ সহ দধি প্রভৃতি কিছু সামান্য লঘুপাক দ্রব্য আহার করিবে। পচা বা গুরুপাক দ্রব্য আহার করিবে না। পেটের অসুখ বোধ হইলে বা পরিপাকশক্তি কম হইলে প্রথমে আদা, জোয়ান ও লবণ মিশ্রিতকরতঃ চিবাইয়া রস খাইবে।

গ্রামে কলেরা দেখা দিলে প্রত্যহ প্রাতে 'এসিড সালফ ডিল' ১০ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করিবে।

(৬) শুশ্রূষাকারিগণ রোগীকে স্পর্শ করিবার পর ফিনাইল অথবা অন্য কোন বিশোধক দ্রাবণে ভালরূপে হাত না ধুইয়া কদাচ হাত মুখে দিবে না। ঐ সকলের অভাবে সোডা মিশান গরম জল ব্যবহার করিবে। রোগীর ব্যবহৃত থালা, বাটি বা অপর কোন দ্রব্য বিশোধিত না করিয়া ঘরের বাহিরে আনিতে দিবে না। উহা সম্যক্‌রূপে অগ্নিতাপে পোড়াইয়া লইলেও চলিবে।

(৭) রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া হস্ত-পদাদি ভালরূপ ধৌত করিয়া বিশোধক দ্রাবণ-দ্বারা পুনরায় ধৌত করিবে। জামা, কাপড় প্রভৃতি ছাড়িয়া পৃথক্‌ এক প্রস্থ পরিবে এবং ছাড়াগুলি গরম জলে ফুটাইয়া ও বিশোধক দ্রাবণে সিক্ত করিয়া লইবে। তাহা না পারিলে, অন্ততঃ ৬ ঘণ্টাকাল প্রখর রৌদ্রতাপে রাখিলেই উহা সংশোধিত হইবে।

(৮) কলেরা রোগীর মল ও বমিতে ফিনাইল, অভাবে ছাই, মিশাইয়া শীঘ্রই পোড়াইয়া ফেলিবে। কলেরা রোগীর মল কখনও কোন জলাশয়ে বা খোলা জায়গায় ফেলিবে না। উহা পোড়াইবার সুযোগ না হইলে ঐ ভেদ ও বমিতে বিশোধক দ্রব্য মিশাইয়া উহা বাড়ী ও জলাশয় হইতে দূরে, মাটীতে গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখিবে। মল ও বমিতে যাহাতে মাছি বা পিপীলিকা বসিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

(৯) বাড়ীর নিকটে পচা গোবরের স্তূপ বা অন্য কোন প্রকার পচা দ্রব্যাদি কিম্বা খোলা পায়খানা রাখিবে না। বাড়ীর নিকটস্থ জঞ্জালাদি পোড়াইয়া ফেলিবে।

(১০) বাজারের দূষিত জল মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে না।

(১১) কলেরাবাহক ব্যক্তিদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে।

(১২) কলেরা রোগীর মৃত্যু হইলে বিশোধক দ্রব্যে বস্ত্র সিক্ত করিয়া সেই বস্ত্রদ্বারা শবকে আবৃত করিয়া রাখিবে এবং যথাসম্ভব সত্বর দাহ করাইবে। রোগী সারিয়া উঠিলে তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিশোধক দ্রব্যদ্বারা এবং ফুটন্ত জল দ্বারা বিশোধন করিয়া লইবে। স্বল্প মূল্যের দ্রব্যাদি পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

(১৩) সমস্ত সুস্থ ব্যক্তিগণ কলেরার প্রতিষেধক টীকা লইবেন।

চিকিৎসা—রোগীকে বিছানায় শয়ন করাইয়া দিবে। মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য রোগী যেন শয্যা ত্যাগ না করে। মলমূত্র ত্যাগের নিমিত্ত পাত্র রাখিয়া দিবে। রোগীকে প্রচুর পরিমাণে ফুটান শীতল জল পান করিতে দিবে। বমি হইতে থাকিলে তলপেটে সেঁক দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কলেরা রোগে অধুনা প্রচলিত সেলাইন ইঞ্জেকসনই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। ১ পাইণ্ট পরিষ্কার জলে ১২০ গ্রেণ লবণ মিশ্রিত করিয়া ঐ জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। তৎপর ঐ জল হাতের বা পায়ের কোন শিরার মধ্যে পিচকারী দ্বারা

প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকে সেলাইন ইঞ্জেকন দেওয়া বলে। সাধারণতঃ এই প্রকারে তিনচারিবার প্রয়োগ করিতে হয়। চিকিৎসক ব্যতীত এই ঔষধ প্রয়োগ করা চলিতে পারে না।

উপযুক্ত চিকিৎসক না পাইলে দেড়সের আন্দাজ গরম জলে ছোট আধ চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর **অন্তর্ধৌত** করার ব্যবস্থা করিবে।

অন্য একটি ব্যবস্থা অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৫ কি ৬ গ্রেণ পরিমাণ পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট এক পাইন্ট জলে মিশাইয়া এক এক বারে ২।৩ আউন্স পরিমাণে পান করিতে দিবে। এতদ্ব্যতীত প্রতি আধঘণ্টা অন্তর পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেটের এক একটি পিল রোগীকে খাইতে দিবে। কেওনিস বা ভ্যাসিলিনের সহিত পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেট মিশাইয়া ফেবাটিনের প্রলেপ দিলে ভাল বড়ি তৈয়ার হইবে। প্রথম দিন আধ ঘণ্টা অন্তর। পরে তিন চারি ঘণ্টা অন্তর এক একটি বড়ি সেবন করাইবে।

রোগীর প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত লবণমিশ্রিত জলে অন্তর্ধৌতি বন্ধ করিবে না। পিঠের নিম্নাংশে সেঁক প্রদান করিবে। রোগীকে সর্ব্বদা লেবুর রসমিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে পান করাইবে, উদরাময় কমিয়া গেলে রোগীকে অল্প পরিমাণ ভাতের মণ্ড পথ্য দিবে।

আমাশয় (Dysentery)

লক্ষণ ঃ—আমাশয় রোগ দুই প্রকারের (১) Amœbic ও Bacillary।

(১) একপ্রকার জীবাণু দ্বারা (Amœbic) এমিবিক আমাশয় উৎপন্ন হয়। এই প্রকারের আমাশয় সাধারণতঃ অজীর্ণতাজনিত পাতলা দাস্তের পর দেখা দিয়া থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ রক্ত ও আম মিশ্রিত মল বাহ্যের সহিত নির্গত হয়, পরে রোগের বেগ যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই মলের ভাগ কমিতে থাকে এবং দিনেরাত্রে ২০।২৫ বার রক্তমিশ্রিত আম দাস্ত হয়। এই রোগে পেট-কামড়ানি, পেটে ব্যথা এবং শূল থাকে।

(২) Bacillus dysentery নামক অন্য প্রকার জীবাণু দ্বারা Bacillary আমাশয় জন্মিয়া থাকে। এই রোগ সাধারণতঃ হঠাৎ উপস্থিত হয়। পেটে বেদনা থাকে ও বারবার মলত্যাগের ইচ্ছা জন্মে। ক্রমে মলের পরিবর্ত্তে শুধু আম ও রক্ত পড়িতে থাকে ইহার সঙ্গে জ্বর ও বমি থাকে। রোগের বেগ মৃদু হইলে জ্বর না-ও থাকিতে পারে।

রোগের কারণ—উভয় প্রকার আমাশয়ের জীবাণুই খাদ্য বা পানীয়ের সহিত উদরে প্রবেশ করিয়া ঐ রোগ জন্মাইয়া থাকে।

আমাশয়গ্রস্ত রোগীর মলের সহিত আমাশয়ের জীবাণু নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং (১) আমাশয় রোগীর মলের উপর মাছি, পিপড়া প্রভৃতি বসিতে পারিলে তাহাদের শরীরে ঐ রোগের জীবাণু সংযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল মাছি ও পিপড়াদ্বারা দূষিত খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে আমাশয় জন্মিতে পারে। (২) পানীয় জলাশয়ে রোগীর মলদুষ্ট বস্ত্রাদি

কাচিয়া সেই জল পান করিলে আমাশয় জন্মিতে পারে। (৩) আমাশয় রোগীর মল শুকাইয়া ধূলার সঙ্গে বায়ুর সাহায্যে চালিত হইয়া খাদ্য বা পানীয়কে দূষিত করিলে সেই দূষিত খাদ্য উদরস্থ হইলেও আমাশয় জন্মিতে পারে।

নিবারণের উপায়—(১) রোগীর মলত্যাগের পরক্ষণে তাহাতে মাটী বা ছাই চাপা দিবে এবং অবিলম্বে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে। (২) রোগীর মলযুক্ত বস্ত্রাদি বিশোধক দ্রাবণে সিক্ত করিয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। কখনও পানীয় জলাশয়ের ভিতরে বা তাহার নিকটে রোগীর মলদুষ্ট কাপড়-চোপড় কাচিবে না। (৩) পানীয় জল ফুটাইয়া পান করিবে। (৪) মাছি, পিপড়া বা ধূলাদ্বারা পানীয় বা খাদ্য দ্রব্য দূষিত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। (৫) শুশ্রূষাকারিগণ শুশ্রূষার পরেই বিশোধক দ্রাবণদ্বারা হাত পরিষ্কার করিবে (৬) রোগীকে পৃথক্ করিয়া রাখিবে।

চিকিৎসা—রোগীর ধীরভাবে বিছানায় শুইয়া থাকা বিশেষ প্রয়োজন। মলত্যাগের জন্য যাহাতে বিছানা হইতে উঠিতে না হয় তজ্জন্য বেডপ্যানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাশয় রোগে শান্তভাবে বিছানায় শুইয়া থাকা চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ। 'এ্যামিবা' জাতীয় আমাশয়ে রোগীকে তরল খাদ্য দিতে হইবে; এক আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল বা কিয়ৎ পরিমাণ এপসম সল্ট বা গ্লবার সল্ট দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইতে হইবে। ক্যাষ্টর অয়েলের কাজ হইলে চিকিৎসকের সাহায্যে "এমেটিন"

ইঞ্জেকসন দিতে হইবে। চিকিৎসক পাওয়া না গেলে বাজার হইতে এমেটিন ট্যাবলেট সংগ্রহ করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আধগ্রেণ করিয়া দশ দিন ধরিয়া খাওয়াইবে। এই কয়দিন রাত্রিতে কিছু খাইতে দিবে না। খাইলে বমি হইবে; এমেটিন না পাইলে কয়েক দিন ধরিয়া দিনে দুইবার করিয়া ১০—২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত ইপিকাক সেবন করাইবে। 'ইপিকাক' খাইবার পূর্ব্বে বা পরে তিন ঘণ্টার মধ্যে কিছু খাইবে না। খাইলে বমি হইতে পারে। রোগের কঠিন অবস্থায় তলপেটে সেঁক দিলে পেটবেদনার কতকটা উপশম হইবে। এক পাইণ্ট জলে ছোট এক চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধৌত করিয়া দিলে বারবার বাহ্যের বেগ কমিয়া আসিবে।

পুরাতন আমাশয় রোগে সর্ব্বত্রই কয়েকদিন ধরিয়া 'এমেটিন' বা 'ইপিকাক' দিতে হইবে, এবং প্রতিদিন অল্প পরিমাণে একমাত্রা 'ক্যাষ্টর অয়েল' দিতে হইবে। রোগীকে অন্ন মণ্ড ব্যতীত অপর কিছু পথ্য দিবে না। 'এমেটিন' বা 'ইপিকাকে' উপকার না হইলে তিন পোয়া গরম জলে ছোট তিন চামচ 'সোডা বাইকার্ব্বনিট' মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধৌত করাইবে। জল বাহির হইয়া গেলে আধ পাইণ্ট গরম জলে ছোট দুই চামচ 'বোরাসিক এসিড', অথবা ছোট চামচের আধ চামচ লবণ মিশাইয়া পুনরায় ডুস দ্বারা অন্তর্ধৌত করাইবে। প্রত্যহ এইরূপ করিতে হইবে।

খোস-পাঁচড়া—(Scabies & Itches)
খোস কৃমি—(Itches worms)

খোসকৃমি আমাদের চর্ম্মের বহিরাবরণের নিম্নে থাকে, এবং সেখানেই ডিম পাড়ে। তাহারা তথায় থাকিয়া চামড়ার নীচে গর্ত্ত করিতে থাকে এবং তাহাতে ঐ স্থান অত্যন্ত চুলকায়। নখদ্বারা চুলকানের সময় নখের সহিত উহারা বাহির হইয়া আসে। সেই নখদ্বারা অন্যস্থান চুলকাইলে সেই স্থানেও খোস রোগ জন্মে। খোস হইতে যে সকল পূঁয বা রস নির্গত হয়, তাহার মধ্যেও ঐ সকল খোস কৃমি থাকে। সুতরাং খোস রোগীর পরিধেয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে ঐ রোগ জন্মিয়া থাকে।

নিবারণের উপায়—(১) রোগীর সংস্পর্শ ত্যাগ করিবে। (২) রোগীর বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না। (৩) রোগী গন্ধকের তৈল বা মলম ব্যবহার করিবে।

প্রতিকার—প্রথমে রোগী গরম জল ও সাবান দ্বারা ভালরূপে শরীর ধৌত করিয়া ফেলিবে। তিন ভাগ গন্ধক গুড়া এবং শতভাগ এ্যামেলিন বা কচি নারিকেল তৈল ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া একটা মলম তৈয়ার করিয়া তিন দিন ধরিয়া প্রাতে ও রাত্রে পাঁচড়ায় লাগাইবে। এই তিন দিন পরিধানের কাপড় বা বিছানা পরিবর্ত্তন করিবে না। তিন দিবস পরে সাবান ও গরম জল দ্বারা স্নান করিয়া পরিষ্কার বিছানাদি ব্যবহার করিবে।

চোখ-উঠা (Conjunctivities)

ইহাও একটি সংক্রামক ব্যাধি। এক প্রকার বীজাণু দ্বারা এই রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। ইহাতে চোখে বেদনা হয়। চোখ লাল হয়। পিঁচুটীতে চোখ জুড়িয়া যায়। আলোর দিকে তাকান যায় না। অনেকদিন রোগ ভোগ করিলে ইহাতে চক্ষু একেবারে নষ্টও হইতে পারে।

নিবারণের উপায়—কাহারও এই রোগ হইলে তাহার সঙ্গে বসবাস করা উচিত নহে। তাহার ব্যবহৃত কাপড়চোপড়, গামছা ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। যে ব্যক্তির ঐ রোগ হইয়াছে তাহার চক্ষু নীল চশমা দ্বারা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা ও উপযুক্ত চিকিৎসা করান আবশ্যক।

প্রতিকার—আধ ছটাক জলে ১০ গ্রেণ বোরিক এসিড—এই হিসাবে এক বোতল পরিমাণ বোরিক লোসন তৈয়ার করিয়া একটি পরিষ্কার বোতলে উহা রাখিয়া দিবে। তিন চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর ফোঁটাফেলা যন্ত্রদ্বারা ঐ ঔষধ ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া চক্ষের মধ্যে দিবে। অথবা একটি "আই-বাথ" ঐ ঔষধে পূর্ণ করিয়া চক্ষু ধুইয়া এক ফোঁটা করিয়া আরজিরন সলিউশন (শতকরা ১০ মাত্রা) দিবে।

বেরিবেরি

এই রোগে কাহার কাহার হাত পা আংশিকভাবে অবশ হইয়া যায় ও চামড়া অসার হইয়া পড়ে। রোগীর পা ক্রমশঃ

শুকাইতে থাকে এবং পায়ের ডিম চাপিয়া ধরিলে সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে। কোন কোন সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত অথবা গলার স্বর ক্ষীণ হয় বা একেবারে বসিয়া যায়।

কাহার কাহার ও বেরিবেরি হইলে হাত, পা ও শরীর খুব ফুলিয়া যায়। প্রশ্বাস লইতে খু্ব কষ্ট হয়, হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হয়। পায়ের ডিম চাপিয়া ধরিলে যন্ত্রণায় চীৎকার করে। এই দুই প্রকার বেরিবেরির কোন প্রকারেই জ্বর থাকে না; জিহ্বা পরিষ্কার থাকে, পাতলা বাহ্য বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিতে পারে।

নিবারণের উপায়—কলে ছাটা চাউল ও ভেজাল তৈল খাওয়াই বেরিবেরির কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। অতএব এই রোগ নিবারণের জন্য কলে ছাটা চাউলের ভাত না খাইয়া ঢেঁকি-ছাটা বা আছাটা চাউলের ভাত এবং বিশুদ্ধ পরিষ্কার তৈল আহার্য্যরূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

প্রতিকার—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ক্যাষ্টর অয়েল বা কিছু সেলাইন ল্যাক্‌সেটিভ ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। দেহ পুষ্টির জন্য যাহা যাহা খাওয়া দরকার তাহা করিতেও চেষ্টা করিবে। ছোট এক চামচে গাঁজনা বড় এক চামচে ফুটন্ত দুগ্ধে দিয়া সুস্বাদু করিবার জন্য কতকটা সর দিয়া নাড়িয়া আহারের শেষে খাইতে হইবে। নরম আধ সিদ্ধ ডিম, টাট্‌কা দুধ, শুঁটি, মটরশুঁটি, শিম, মসূর ডাল, লেবুর রস, আখরোট এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে

সংগৃহীত ভাইটামিন—এই সকল খাদ্য বেরিবেরি রোগের পক্ষে উপকারী। রোগীর সকল লক্ষণ দূরীভূত হইলেও কয়েক সপ্তাহ খাদ্য সম্বন্ধে ঐরূপ সতর্ক হইতে হইবে।

হাম

এই রোগের আক্রমণের প্রারম্ভে সর্দ্দি হয়, নাক দিয়া জল পড়ে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং জ্বর আরম্ভ হইয়া থাকে। তিন চারি দিন পরে হাম বাহির হয়। প্রথম প্রথম মুখের উপর মশার কামড়ের মত লাল দাগ উঠে। তার পর দুই তিন দিনের মধ্যে উহা সমস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। সাধারণতঃ ৪।৫ দিন জ্বরভোগ করিবার পর জ্বর ছাড়িয়া যায়; কিন্তু যদি কাসি থাকে তাহা হইলে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে ইহার পরে নিউমোনিয়া, উদরাময়, আমাশয়, ইত্যাদি হইতে পারে।

নিবারণের উপায়—হাম অতিশয় সংক্রামক রোগ, কাহারও হাম হইবামাত্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন উহা হইতে অন্য কোন শিশু পীড়িত না হইয়া পড়ে। পীড়িত শিশুকে পৃথক্ করিয়া রাখিবে। তাহার সহিত অন্য কোন শিশুকে মিশিতে দিবে না। রোগীর ব্যবহৃত বিছানা, কাপড়-চোপড় শোধন না করিয়া অন্য কেহ ব্যবহার করিবে না।

প্রতিকার—হাম আরোগ্য কবিবার কোন ঔষধ নাই। হাম প্রকাশ পাইবার পর শিশুর ভালরূপ শুশ্রূষা করিলে

আপনাআপনি উহা সারিয়া যায়। শিশুকে পরিষ্কৃত কক্ষে পরিষ্কার বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে। উহাকে সর্ব্বদা গরমে রাখিতে হইবে। কারণ, ঠাণ্ডা লাগিলে ফুসফুসের কঠিন ব্যাধি জন্মিতে পারে। বুকে বেদনা হইলে এবং কাসি দেখা দিলে বুকে দৈনিক তুইবার গরম সেঁক দিতে হইবে।